দস্তাম্বু

সিপাহি বিদ্রোহের রোজনামচা

মির্জা গালিব

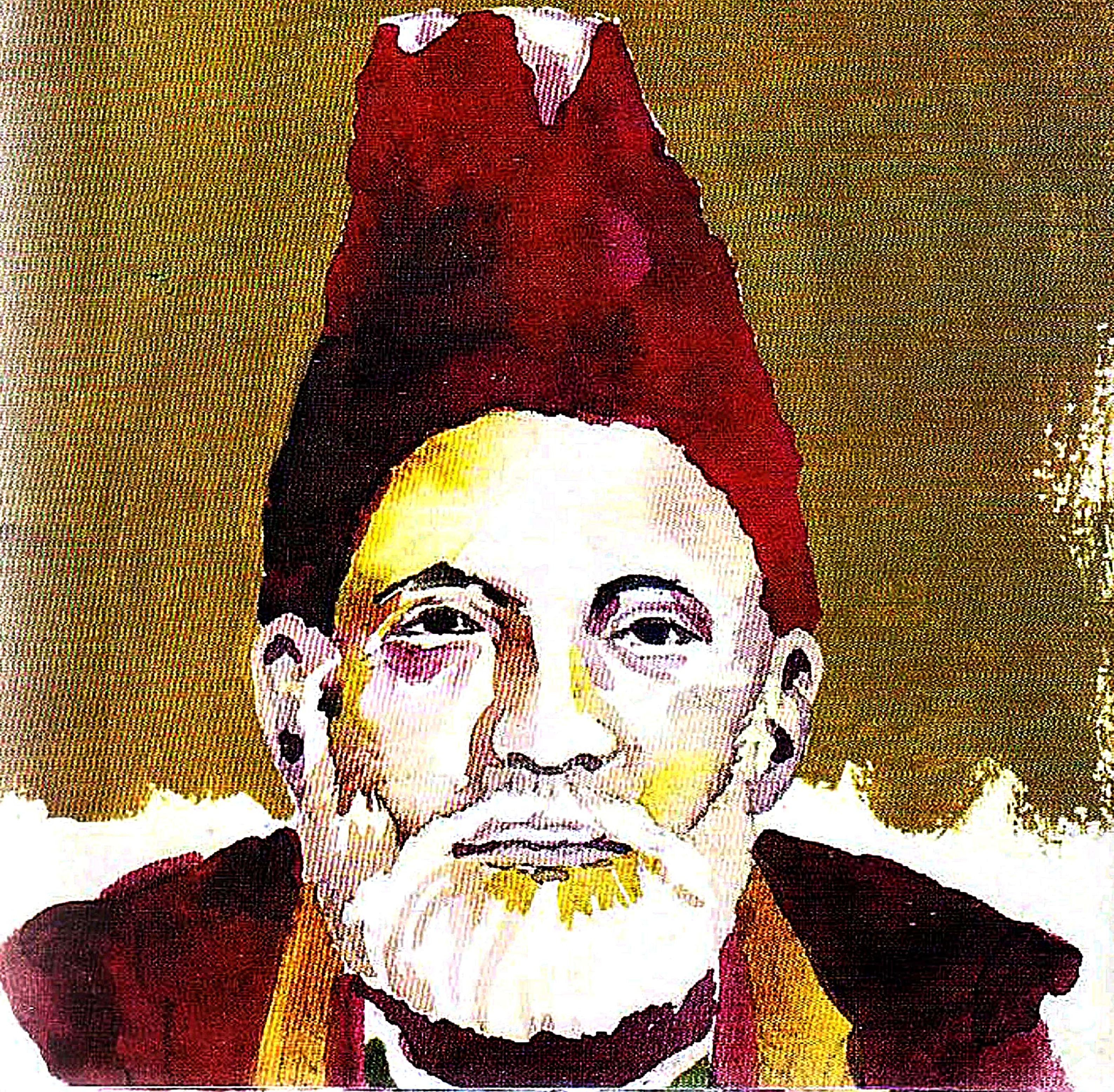

সিপাহি বিদ্রোহ মির্জা গালিবের
জীবন তছনছ করে দেয়।
এই বিদ্রোহের অভিঘাত-সৃষ্ট রাজনৈতিক
আলোড়ন নানাভাবে প্রত্যক্ষ
করেছেন তিনি। সেই সব দিনের
ধারাবাহিক বিবরণ বিধৃত হয়েছে
তাঁর এই রোজনামচায়।
একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে
তাঁর দুঃসহ জীবনেরও দিনপঞ্জি।

ISBN 978 984 8765 65 4

9 789848 765654

দাস্তাম্বু

মির্জা গালিব

সিপাহি বিদ্রোহের রোজনামচা

অনুবাদ

জাফর আলম

প্রথমা প্রকাশন

দাস্তাম্বু

গ্রন্থস্বত্ব © অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪১৭, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১১
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : এক শ পঞ্চাশ টাকা

Dastambouy
Mirza Ghalib's Diary : Reflection on Sepoy Mutiny, 1857
Translated by *Zafar Alam*
Published in Bangladesh by *Prothoma Prokashan*
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Price : Taka One Hundred Fifty only

ISBN 978 984 8765 65 4

উৎসর্গ

ড. আবদুস সবুর খান
সহকারী অধ্যাপক
ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদকের কথা

মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিবের জন্ম অখণ্ড ভারতবর্ষের এক যুগসন্ধিক্ষণে। তাঁর জীবনের সেই কালপর্ব কেবল রাজা-বাদশার উত্থান-পতনের মধ্যেই সীমিত ছিল না বরং সেটা ছিল মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনার ঊষালগ্ন মোগল আমলে আকর্ষণীয় জীবিকা ও সম্মানজনক পদের জন্য বিদেশি ভাগ্যান্বেষীদের ভারতে আগমন ঘটত। গালিবের পিতামহ কোকান বেগ খান তেমনি একজন ভাগ্যান্বেষী। জীবিকার সন্ধানে তিনি সমরখন্দ থেকে ভারতে এসেছিলেন। চাকরি নিয়েছিলেন সম্রাট শাহ আলমের অধীনে। আর তাঁর পিতা আবদুল্লাহ বেগ লক্ষ্ণৌতে প্রথমে নবাবের অধীনে, পরে হায়দারাবাদের নিজামের দরবারে চাকরি নেন।

ভারতের এক চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে গালিবের জন্ম। কৈশোর ও যৌবনে আগ্রা ও দিল্লিতে অবস্থানকালে মোগল সাম্রাজ্যের পতন এবং ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। জীবদ্দশায় নানাজনকে লেখা তাঁর চিঠির পর চিঠির মাধ্যমে এই সময়কার টালমাটাল ঘটনার ছবি খুবই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । জীবিকার সুবাদে তিনি দিল্লির পতনশীল মোগল সম্রাটের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ফলে তিনি শেষ মোগল সম্রাটের আমলের তথা অরাজক মোগলশক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক কোনো লেখা লেখেননি।

ব্রিটিশদের আগমনে ভারতের রাজনীতিতে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে থাকে। মোগল সাম্রাজ্যের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে ব্রিটিশরা ক্রমে গোটা ভারতের শাসনভার দখল করে বসে। তারা নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার নতুন চিন্তা-চেতনার ধারা অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতবাসী এই নতুন চিন্তা-চেতনার সংস্পর্শে এসে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করে এবং তাদের চিন্তাধারায় আলোড়নের সৃষ্টি হয় গালিবের জীবনেও এই আলোড়নের ছোঁয়া লেগেছিল। কলকাতায় অবস্থানকালে গালিব আধুনিক ভারতের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসেন। তিনি কলকাতা থেকে *মিরাত উল আখবার* নামে ফার্সি ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন, গালিবকে যা দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। দিল্লি বা অন্য কোথাও তখন পর্যন্ত উন্নত মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হয়নি। কলকাতা থেকে আসা উর্দু বা ফার্সি সংবাদপত্র পাঠ করা আধুনিকতায় বিশ্বাসী গালিবের অভ্যাসে পরিণত হয়। আজীবন তা অব্যাহত ছিল। ইংরেজ সভ্যতায় যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও অনুষঙ্গ আছে, তিনি সেটা সম্যক বুঝেছিলেন।

মির্জা গালিবের জীবনের বিশেষ একটি সময়ের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার চিত্র তাঁর রচিত একান্ত দিনলিপি *দাস্তাম্বুতে* ফুটে উঠেছে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় দিল্লি শহরের অবস্থা, তাঁর নিজের শোচনীয় ও কপর্দকহীন দশা, অনাহারক্লিষ্ট জীবন, মদের অভাব, বন্দিজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার কথা তিনি তাঁর এই দিনলিপিতে তুলে ধরেছেন। অবশ্য তিনি সিপাহি বিদ্রোহীদের গণহত্যার সমালোচনা করলেও দিল্লি শহর আবারও দখল করার পর ব্রিটিশ সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞের তেমন একটা সমালোচনা করেননি। তাঁর এই দুর্বলতার মূলে ছিল বোধ হয় ইংরেজ সরকারের দেওয়া পেনশনের ওপর তাঁর নির্ভরশীলতার বিষয়টি। তার পরও *দাস্তাম্বুতে* গালিবের ইতিহাস-সচেতনতার ছাপ সুস্পষ্ট।

গালিব নিজের একান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়-বলে শিখেছিলেন দর্শন, জ্যোতিষ ও তর্কশাস্ত্র আর সংগীত। *দাস্তাম্বুর* মুখবন্ধ ও ভূমিকা পাঠ করে আমরা তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান কতটা গভীর ছিল, সে সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করতে পারি।

গালিব কোনো আত্মজীবনী লেখেননি। *মুসাদ্দাসে হালি* গ্রন্থের লেখক গালিব-শিষ্য মওলানা আলতাফ হোসাইন হালি *ইয়াদগারে গালিব* নামে যে স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ লিখেছেন, তার অনেকখানি জায়গাজুড়ে আছে গালিবের জীবনকথা। এই প্রেক্ষাপটে দিনলিপি *দাস্তাম্বুকে* বড়জোর গালিবের জীবনের খণ্ডচিত্র বলা যায়, কোনোক্রমেই তাঁর পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী নয়।

মির্জা গালিব শুধু উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠতম কবি ছিলেন না, উর্দু গদ্যেও তিনি তাঁর প্রতিভার গভীর স্বাক্ষর রেখেছেন। গালিবের গদ্যের সৌন্দর্যের মূলে তাঁর সরলতা, ঋজুতা ও বাকভঙ্গি। তিনি দৈনন্দিন জীবনে আমজনতার ব্যবহার করা চলতি ভাষায় ছোট ছোট বাক্যে, কথার পিঠে কথা জুড়ে দিয়ে গভীর ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর গদ্য যেন কথোপকথন। এ কথা *দাস্তাম্বুর* বেলায় যেমন প্রযোজ্য, একইভাবে প্রযোজ্য তাঁর চিঠিপত্রের বেলায়ও। তাঁর বর্ণনার ধরন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও মার্জিত। এখানেই নিহিত গালিবের গদ্যের শৈলীগত সাফল্যের রহস্য।

গালিব শুধু একজন কবি নন, ছিলেন একটি যুগ এবং একটি নতুন সভ্যতারও প্রতীক। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর রশীদ আহমদ সিদ্দিকীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'মোগলরা ভারতকে তিনটি জিনিস দিয়েছেন, তাজমহল, উর্দু এবং গালিব। এ তিনটি একই সভ্যতার একত্বের বিভিন্ন দর্শনীয় রূপ। তাজমহলের পাথর ও ইটকে যদি শব্দে ও বর্ণনায় মিশ্রণ করা যায়, সেটা গালিবের শায়েরি ছাড়া অন্য কিছু নয়। গালিবের কাব্য উর্দু ভাষায় সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, শক্তিশালী ও অনুপম প্রদর্শনের বস্তু।'

তরুণ উর্দু কবি জাভেদ হুসেন গালিবের ফার্সি থেকে উর্দুতে অনুবাদ করা *দাস্তাম্বু* বইটি আমাকে উপহার দেন এবং বাংলায় অনুবাদের জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আবদুল সবুর খান ফার্সি শব্দের বাংলা উচ্চারণ ও কবিতা অনুবাদে সাহায্য করেছেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ গোলাম রব্বানীও আমাকে সহযোগিতা করেছেন। *দাস্তাম্বু* অনুবাদে এই তিনজনের সহযোগিতা আমাকে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মির্জা গালিবের রোজনামচা *দাস্তাম্বু*র বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে *প্রথমা প্রকাশন* থেকে। এ জন্য আমি আনন্দিত।

গত বছর *প্রথমা প্রকাশন* আমার অনূদিত *কৃষণ চন্দরের দাঙ্গার গল্প/পেশোয়ার এক্সপ্রেস* খুবই যত্নের সঙ্গে প্রকাশ করেছে। বইটির প্রকাশনার মান অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী কভার ডিজাইনও বইটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

দাস্তাম্বু প্রকাশের ব্যাপারে আমি প্রথমা প্রকাশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মালঞ্চ, মিরপুর-৬
ঢাকা ১২১৬

জাফর আলম

সূচিপত্র

দাস্তাম্বু প্রসঙ্গে গালিব ১৩
মুখবন্ধ ১৭
ভূমিকা ২১
আরব-ইরান যুদ্ধের সঙ্গে সিপাহি বিদ্রোহের তুলনা ২৩
কেল্লার চাকরি ২৫
১১ মে ১৮৫৭ ২৫
অসহায়ত্ব ও ঘরের কোণে বসে থাকা ২৬
ইংরেজ হত্যায় দুঃখ প্রকাশ ২৭
বিদ্রোহীদের নিন্দা ২৮
ভদ্র পরিবারের পতন ২৯
বিদ্রোহের নিন্দা ৩০
বাদশাহের অসহায়ত্ব ৩১
কয়েদিদের মুক্তিদান ৩২
সেনাসংখ্যা ৩২
ইংরেজদের সামরিক ব্যূহ তৈরি ৩২
হাকিম আহসান উল্লাহ্ খান ৩৪
তোফাজ্জল হোসাইন খান ৩৫
খান বাহাদুর খান ৩৫
নবাব ইউসুফ আলী খান ৩৫
লক্ষ্ণৌর ঘটনা ৩৫
১৪ সেপ্টেম্বর ৩৭
ইংরেজদের বিজয় ও অত্যাচার ৩৮
১৮ সেপ্টেম্বর ৩৯
গলি তালাবন্ধ ৪০
মহারাজা পাতিয়ালার সহায়তা ৪০
পানি ও গমের অভাব ৪১
গালিবের জীবনচরিত ৪৩
মির্জা ইউসুফ ৪৪
রানি ভিক্টোরিয়ার প্রশংসায় কাসিদা রচনা ৪৫
গালিবের তিনটি দাবি ৪৬
হতাশাপূর্ণ উত্তর ৪৭

মির্জা ইউসুফের বাড়িতে লুটতরাজ ৪৮
ইংরেজ সৈন্যদের জনপ্রিয়তা এবং শান্তির অঙ্গীকার ৪৮
কর্নেল ব্রাউনের সামনে হাজিরা দান ৫০
৭ অক্টোবর ৫০
মেয়োতিদের গোলযোগ ৫১
গৃহবন্দী ৫২
রোজনামচা লেখার কৈফিয়ত ৫২
১৯ অক্টোবর ৫৩
মির্জা ইউসুফের দাফন ৫৪
মির্জা ইউসুফের মৃত্যুর তারিখ ৫৪
লোহারু শাসকের বিনাশ ৫৫
জাহ্জার ও ফররুখ নগরের শাসক গ্রেপ্তার ৫৬
বাহাদুরগড় ও বল্লভগড়ের শাসনকর্তা গ্রেপ্তার ৫৭
যুবরাজ সমাচার ৫৮
জায়গিরদার হত্যা ৫৮
জানুয়ারি ১৮৫৮ ৫৯
হাকিম মাহমুদ খানের পরিবারের লোকজন গ্রেপ্তার ৫৯
৫ ফেব্রুয়ারি ৫৯
স্যার জন লরেন্সের প্রশংসায় কাসিদা ৬০
২০ ফেব্রুয়ারি লক্ষ্ণৌ বিজয়ের সুসংবাদ ৬০
২৪ ফেব্রুয়ারি চিফ কমিশনারের আগমন ৬১
২৭ ফেব্রুয়ারি ৬১
অসংখ্য লোকের ফাঁসি ৬২
৮ মার্চ ৬২
১৭ মার্চ ৬৩
১৮ মার্চ লক্ষ্ণৌ বিজয় ৬৩
হাকিম মাহমুদ খানের পাতিয়ালা যাত্রা ৬৫
মুরাদাবাদ বিজয় ৬৬
বেরিলি বিজয় ৬৬
১৩ জুন বাহাদুর জং খানের অবস্থা ৬৬
গোয়ালিয়র বিজয় ৬৭
হিন্দু শিষ্য ও বন্ধুদের সাহায্যদানের স্বীকৃতি ৬৯
বিধ্বস্ত বাড়ি ৭০
অভাব-অনটন ও অসহায় অবস্থা ৭১
দস্তম্বু প্রসঙ্গে ৭২
পরিশিষ্ট ৭৯

দাস্তাম্বু প্রসঙ্গে গালিব

দাস্তাম্বু মির্জা গালিবের পুরোনো ফার্সি গদ্যে লেখা রোজনামচা বা দিনলিপি। এর অর্থ পুষ্পস্তবক। তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের সময় মে মাসের প্রথম থেকে ১৮৫৮ সালের ২১ জুলাই পর্যন্ত এই ১৫ মাস দিল্লি শহরের পরিস্থিতি এবং তার প্রেক্ষাপটে নিজের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে এই দিনলিপি লিখে যান। *দাস্তাম্বু*তে ব্যবহার করা হয়নি আরবি কোনো শব্দ। তিনি জানাচ্ছেন—

> 'মুন্সি উম্মিদ সিংহকে আমার এক বন্ধু আমার বাসায় নিয়ে আসেন। তিনি আমার এই দিনলিপি ছাপার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আগ্রায় আমার শিষ্য মুন্সি হরগোপাল তুফ্‌তার কাছে আমার দিনলিপির পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিই। তিনি এর ছাপার দায়িত্ব নেন। প্রতি পুস্তকের ছাপা-বাঁধাই বাবদ মূল্য ধার্য করা হয় আট আনা। মোট ছাপা কপির মধ্যে ৫০ কপি মুন্সি উম্মিদ সিংহ কিনে নেওয়া বাবদ পাওয়া ২৫ কপি ছাপাখানার বরাবর হুন্ডি করে পাঠিয়ে দেন। আগ্রার প্রশাসককে পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে তাঁর অনুমোদন নেওয়া হয়। দিনলিপি ছাপা হয় মোট ৫০০ কপি। প্রথম সংস্করণের সব বই বিক্রি হয়ে যায়। ১৮ আনার টিকিট পাঠিয়ে *দাস্তাম্বুর* দুই কপি আগ্রা থেকে আনিয়ে নিই আর পাঠিয়ে দিই লক্ষ্ণৌয়ে। তা ছাড়া আমার দিনলিপির দুই কপি

> বিলাতে পাঠাই এবং এক কপি করে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিই স্থানীয় ব্রিটিশ শাসক গভর্নর জেনারেল, চিফ কমিশনার দিল্লির কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট সবার কাছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লে. গভর্নর জর্জ ফেডারিক এডমনস্টনের কাছেও এক কপি *দাস্তাম্বু* পাঠিয়েছি। তাঁর প্রশংসা করে ফার্সিতে একটি কাসিদাও লিখে বইয়ের সঙ্গে পাঠাই। প্রাপ্তিস্বীকার ও জবাব যথারীতি ডাকযোগে পেলাম। পাঞ্জাবের লে. গভর্নর বরার্ট মন্টগোমরির প্রশংসাসূচক ফার্সি কাসিদাও দিল্লির কমিশনারের মাধ্যমে পাঠাই : তার উত্তরও ডাকযোগে পোস্ট অফিসের সিলমোহরসহ পাই। কিন্তু এসব উত্তরপত্রে আমার পেনশনের ব্যাপারে কোনো বক্তব্য ছিল না তবুও আশায় থাকি।'

এই ছিল *দাস্তাম্বু* সম্পর্কে মির্জা গালিবের বক্তব্য।

এতে দিল্লিতে বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি যে দুঃসহ জীবন যাপন করেন, তার বিবরণ এবং সিপাহি বিদ্রোহ ও দিল্লিতে তখন নিজের চোখে দেখা ঘটনা ও অন্যের মুখ থেকে শোনা হালহকিকতের প্রায় বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। নয়াদিল্লির তরক্কিয়ে উর্দু ব্যুরো ১৯৯৪ সালে *দাস্তাম্বুর* উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করে। ফার্সি থেকে উর্দুতে অনুবাদ করেছেন প্রফেসর খাজা আহমদ ফারুকী। সেই উর্দু সংস্করণেরই বাংলা অনুবাদ এই বই।

আমি এই পুস্তকের রচনা শুরু করছি
মহান সৃষ্টিকর্তার নামে
যিনি শক্তিদাতা
চাঁদ, সূর্য এবং দিন ও রাতের সৃষ্টিকর্তা।

মুখবন্ধ

তিনি বিপুল শক্তিধর সম্রাট, যিনি নয়টি আকাশকে উঁচুতে তুলে ধরেছেন এবং সাতটি নক্ষত্রকে আলো দান করেছেন। তিনি মহান খোদা—বিশ্বের মালিক। তিনি মানুষের দেহে প্রাণ দান করেছেন এবং মানুষকে সাম্রাজ্য ও সুবিচার (সমূহ) প্রদান করেছেন। তিনি কোনো মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই সাত জমিন এবং নয়টি আসমান সৃষ্টি করেছেন। কঠিন ও সহজ কাজের সমাধান এবং মামুলি ও সামান্য বাধা দূর হওয়া—সবকিছু তাঁরই নির্দেশ ও প্রভাবেরই পরিণতি।

খোদা এই নিয়মকানুন এমনভাবে প্রস্তুত করেননি যে পরস্পর বিপরীতধর্মী বা ভিন্ন ভিন্ন গুণের অধিকারী এসব বড় বস্তু একে অন্য থেকে দূরে দূরে থাকবে এবং (মাঝেমধ্যে) একই স্থানে একত্রিত হয়, শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আনুগত্য প্রকাশ করে না, কাজ করার ক্ষমতা এবং গ্রহণ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নির্দেশের (প্রকৃতির) অধীন নয়।

তুমি আকাশ ও নক্ষত্রের রহস্য জানার দাবি করছ? তুমি তো এখনো চিত হয়ে শোও এবং ঘোমটার পার্থক্য পর্যন্ত বুঝতে পার না। নক্ষত্রের পূজা কর না, অর্থাৎ এ জগতের কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণকারী মালিককে মানবে না। কারণ একটি সূর্যও (খোদা) মজুদ আছে, যার আলোক (জগতের

সবকিছু) বাহ্যিক ও গোপনীয় জিনিসকেও তার বৃত্তের মধ্যে রেখেছে। যদি শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহে (চন্দ্রের বাইশ তারিখ অনুসারে) উপকারে পৌঁছানোর যোগ্যতা রাখে, শনি ও মঙ্গল গ্রহ (অমঙ্গল হওয়ার আশঙ্কায়) ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, তাহলে তা হতে দাও। যাঁরা প্রকৃত ঘটনা জানেন, তাঁরা জানেন, অমঙ্গল ও সৌভাগ্য, আনন্দ ও দুঃখের উৎস কোথায়? নক্ষত্ররাজি একজন সমদৃষ্টিসম্পন্ন বিচারক বাদশাহের অধীন কর্মচারী। তার আদালতের সিপাহি কখনো সুবিচারের বৃত্তের বাইরে কদম রাখতে পারে না। মিলেমিশে কাজ করা এবং কর্মসন্ধান (আদেশ মেনে চলা) ছাড়া আর কোনো কিছুর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। কেউ যদি এদের মধ্যে কঠোরতার (অজুহাতে) সঙ্গে কোনো জটিল কাজ সমাধা করার চেষ্টা করে, অথবা কোনো উদারতার (মাধ্যমে) জন্য কোলাহলময় জীবন আলোকিত করে, তাহলে এসব জীবনকে সুসজ্জিত করার এবং অসুবিধা দূর করার বিবিধ-পদ্ধতি রয়েছে, জুলুম অথবা বেপরোয়ামির ভেতর দিয়ে যা অর্জন করা সম্ভব নয়।

সংগীতজ্ঞ বেহালার তারে নাড়া দেন। এর উদ্দেশ্য কী, সবার জানা। দুঃখের পর্দার আড়ালেই আছে আনন্দ। ধোপা রেগে গিয়ে কখনো পাথরে কাপড়ের আঘাত করে না।

প্রকৃত কোনো জিনিসের মৃত্যু মানে অন্য কোনো প্রাণের জন্ম নয়। বস্তুত মানুষ আরাম ও কষ্ট এবং উন্নতি ও অবনতি সবকিছু (খোদার কাছ থেকে) ভোগ করে থাকে। তাই তারা ওই সব সুবিধা ও কল্যাণের বাহন বা বাহকে পরিণত হয় এবং এতে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায়।

ধনী যদি কোনো অভাবী লোককে কিছু পয়সা অথবা হাজার টাকা দান করে, রেশম কাপড়ের একটি থান অথবা কম্বল দান করে, তাহলে (সব ক্ষেত্রে) সেটা হবে বদান্যতা এবং দরবেশ প্রতিপালনতুল্য কিছু। প্রকৃতির উপহারকে ভালো-মন্দে পরিমাপ করা অথবা তার সম্পর্কে কমবেশি (অভিযোগ করা) সংকীর্ণ ধারণা পোষণ করা স্বল্প বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় বহন করে।

এটা বিশ্বের উদ্ভট বস্তুগুলো ধ্বংসের শক্তি ও দাপটের কাছে মূল্যহীন। তাদের কাছে কি খোদার এ দান কোনো অংশে কম নয়, যা মজুদ আছে। কিন্তু এসব (হালকা) কথা সংকীর্ণ দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের

কাছে বোধগম্য হবে না। বর্ণনা দেওয়ার শক্তিও তাদের ফুরিয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ মাড়িয়ে তারা নিচে নামে এবং সহজ বর্ণনারীতি অনুসরণ করে। তাদেরই বর্ণিত বক্তব্য পরিষ্কার এবং সহজভাবে সবকিছু তুলে ধরে আর সেটা তরা করে আকাশে সক্রাকারে পরিক্রমারত চক্কি বা গোলকের গতির মতো করে তোমরা ভালোভাবেই জান যে চক্কি (আটা পেষার চাকা) চালনার জন্য লোক অবশ্যই থাকে। তাহলে তোমরা কেন বোঝ না যে আকাশকে চাক্কির মতো কক্ষপথে পরিচালনা করার জন্য অন্য কোনো শক্তি আছে। আকাশের চরকিতে (চক্রাকারে ঘূর্ণন) নক্ষত্ররাজি উপকৃত হয় এবং গ্রহের ঘূর্ণনে কাপড় বোনার সুতার বান্ডিল তৈরি হয়। এগুলো দিয়ে কয়েকটি পর্দা তৈরি করে পৃথিবীবাসীর চোখের সামনে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ এবং সৃষ্টির রহস্য জানা লোকজন পর্দা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দেখে নেন যে প্রত্যেক কাজের উৎস হলেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা।

আকাশের চাক্কির মতো কক্ষপথে পরিভ্রমণ খোদার আদেশের অধীন, তবে তোমরা মুসলমান হলে কেন বল যে আকাশ পৃথিবীকে যা কিছু দান করে, তা নির্যাতনের শামিল।

আল্লাহ কী রকম শক্তিশালী, কত বিশাল যে তিনি প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা এবং কোনো বস্তুকে আবার ধ্বংসও করেন। তিনি জুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধকারী। সুবিচারের আলো ছড়ানোই তাঁর কাজ। তিনি সুবিচারের মাধ্যমে (শক্তি দিয়ে) শক্তিশালীদের শক্তি হ্রাস এবং তাঁর দয়ায় দুর্বলদের শক্তি দান করে থাকেন। আবাবিল পাখির ঠোঁট থেকে নিক্ষিপ্ত ছোট ছোট পাথরের আঘাতে হাতির পিঠের সওয়ার সৈন্যরা মাটিতে মিশে গেছে অথবা একটি মশা নমরুদের নাকের ভেতর ঢুকে তাকে ধরাশায়ী করার নেপথ্যে কী ছিল? নিশ্চয় এগুলো তাঁর (সীমাহীন) স্বর্গীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশেরই নমুনা। তা না হলে, আমাকে বলুন তো, দুটি ভিন্ন ধরনের ধ্বংস দুটি ভিন্ন যুগে ঘটেছে, কোন গ্রহের নিষ্ঠুর দৃষ্টির কোপে এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটল?

তিনি পারস্যের জালিম শাহ জামশিদের কাছ থেকে সিংহাসন ও তাজ ছিনিয়ে নেন। আলেকজান্ডারের হাতে পারস্যের পরাজিত রাজা দারার বুক চিরে হত্যার ব্যবস্থা করেন। হজরত সোলায়মানের হাতের আংটি কেড়ে

নিয়ে যায় দৈত্য, অথচ সোলায়মান দৈত্য ও পরিদের নিয়ন্ত্রণকারী শাসক ছিলেন তোমরা তাঁর উপহার ও শাস্তি সম্পর্কে অবগত নও, কেবল তাঁকে আকাশ ও নক্ষত্রের প্রত্যেক জিনিসের অভিভাবক মনে কর। খোদা এই জগৎ অস্তিত্বহীনতা থেকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সব সৃষ্টিকে একইভাবে ধ্বংসও করতে পারেন। সৃষ্টিকর্তা যেমন একটি শব্দ 'কুন' (অর্থাৎ 'হও') থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাঁর সৃষ্ট জগৎকে ধ্বংস করে দিলে কার সাধ্য এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবে!

ভূমিকা

এই যুগে প্রত্যেক সংগীতের রাগ আর প্রত্যেক জিনিসের রীতিনীতি পাল্টে গেছে। সিপাহি মনিবকে মানে না, বিদ্রোহী হয়ে গেছে। বাগ্‌বিতণ্ডা করে লাভ নেই বরং বলতে দ্বিধা নেই, যুগই বদলে গেছে। গণকদের ধারণা, আরবদের হামলায় ইরানের তৎকালীন সম্রাট দেজদর্দ-এর আনন্দ উৎসব ওলটপালট হয়ে যায়। সে সময় বৃশ্চিক রাশির প্রভাবে শনি ও মঙ্গল গ্রহ দুটো এভাবে একই স্থানে সমবেত হয়েছিল। এখনো মনে হয়, শনি ও মঙ্গল গ্রহ বৃশ্চিক রাশিরই বাসস্থান, যার কোনো উজ্জ্বল তারা নেই। এই বিদ্রোহ, লড়াই, নির্যাতন, রক্তপাত এবং অপমানের যেসব ঘটনা ঘটছে, সে সবই ঘটছে যেন দুষ্ট রাশির প্রভাবে। কিন্তু যাঁরা বাস্তববাদী, তাঁরা এই সংজ্ঞাকে কীভাবে মেনে নেবেন? ইরানের ওপর আরবদের হামলা (বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার) আসলে একটি দেশের ওপর এটা অন্য দেশের সেনা হামলা। কিন্তু এখানে তো সৈন্যরা তাদের মনিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ইরানের পুরোনো কাহিনি থেকে দুটি যুদ্ধের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আরব-ইরান যুদ্ধের সঙ্গে সিপাহি বিদ্রোহের তুলনা

ইরানে আরবদের হামলার ঘটনা ঘটেছিল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। ইরান প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিরান হয়ে পড়েছিল। একটি নতুন ধর্মের বদৌলতে তারা আলোকিত হয়েছিল আর অগ্নিপূজার গোলামি থেকে নিস্তার পেয়েছিল। কিন্তু ভারতে আইনের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে ভারতবাসী নতুন আইনের আশ্রয় নিয়ে নিজেরা আনন্দ প্রকাশ করতে পারে (ব্রিটিশ রাজের আইন)।

ইরানবাসী অগ্নিপূজা থেকে মুখ ফিরিয়ে খোদাকে চেনা ও জানার পথ অনুসরণ করে। কিন্তু ভারতবাসী বিচারক ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বর্বর লোকজনের ফাঁদে বন্দী হয়ে পড়ে। অথচ তারা দেখল, সম্পর্ক ছিন্ন করা আর ন্যায়বিচারের মধ্যে দূরত্ব বেশি নয়। সত্য কথা হলো, ইংরেজ শাসন ছাড়া অন্য কোনো সরকারের কাছে ন্যায়বিচার আশা করা বোকামি মাত্র। আরবদের আক্রমণে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, পবিত্র ইসলাম ধর্মের ছায়ায় সেই ক্ষতের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যদি এসব বিপদ-আপদের পর পরিস্থিতি শান্ত হতো, সর্বত্র শৃঙ্খলা বজায় থাকত, তাহলে বিপদগ্রস্তরা বেদনা ভুলতে পারত। এই ধ্বংসযজ্ঞের পর কোনো বিজ্ঞজন যদি বলতে পারতেন যে তাঁর মনে শান্তি ফিরে এসেছে, তাহলে আমার বেদনাতুর ও আতঙ্কগ্রস্ত মনে শান্তি ফিরে আসত। কিন্তু এখানে কর্মচারীরা বিচারকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, সিপাহিরা অফিসারদের হত্যা করে আনন্দে

মাতোয়ারা। তাদের মধ্যে দুঃখবোধের লেশমাত্র দেখা যায়নি। এ অবস্থায় মনে শান্তি আসবে কী করে? পুরো পরিস্থিতি ছিল যেন আল্লাহর গজবস্বরূপ কিছু। ইরানের যুদ্ধ এমন হতাশা ও লজ্জাজনক এবং ধ্বংসাত্মক ছিল না। বাদ্যযন্ত্র থেকে নিঃসৃত বেদনার সুর উচ্চনাদে পরিণত হয়েছে। অস্থির পরিস্থিতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি এমন অবুঝ নই যে নক্ষত্রের চারদিকে আলো ছড়ানোর পরও তাকে আলোকবিহীন বলে আখ্যা দেব। আকাশ বিশাল ও উঁচু তার যে গুণাগুণ ও লাবণ্য, তাতে তাকে কাঙাল ও মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেব কী করে! আর দুই হতভাগ্য গ্রহ শনি ও মঙ্গলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে একই সুউচ্চ মিনারে একত্রিত হওয়ার কারণে তাদের দুর্ভাগ্যের প্রতীক হিসেবে ধরে নেব আর ভয়ানক পরিস্থিতির প্রত্যাশা করব—এ কী করে হয়! অথচ আজ থেকে এক হাজার বছর আগে আরব-ইরান যুদ্ধের সময় এই ঘটনার সূচনা হয়েছিল।

কালের প্রবাহে আরোগ্য হয় না, আমি এমন এক বিপদে আক্রান্ত। আমার ধারণা, এই পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী লোকজন, যারা জ্যোতির্বিদ্যা আর শনি ও মঙ্গল গ্রহের নাম পর্যন্ত শোনেনি, তারা যেন অদেখা আর না শোনা কথায় কান না দেয়। বরং বুঝে নিতে হবে যে কালের অতীত ও বর্তমানের গোপন রহস্য তাদের বুকে সংরক্ষিত আছে, ভালো লোকজনের কাজকে ওলটপালট করে দেওয়া তাদের পুরোনো অভ্যাস। তারা বেসামরিক লোকজনের লুটতরাজের হাত থেকে ইংরেজদের রক্ষা করার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, বরং তারা চারদিক থেকে ইংরেজদের আক্রমণ করে (বিদ্রোহী) সৈন্যদের বিজয়ী হতে সাহায্য করেছে।

এই গ্রন্থের পাঠকেরা মনে করতে পারেন যে আমার কলমের খোঁচায় শব্দের ব্যঞ্জনায় মুক্তো ঝরে। ইংরেজ সরকারের লবণ-রুটি খেয়ে লালিত-পালিত হয়েছি। বাল্যকাল থেকেই বিশ্ববিজয়ী এই শক্তির দস্তরখানায় বসে খেয়েছি। সাত-আট বছর হলো, দিল্লির সম্রাট আমাকে ডেকে পাঠান এবং তৈমুর বংশের সম্রাটদের ইতিহাস লেখার নির্দেশ

দেন। এই নির্দেশ পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করি আর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি কিছুদিন পর সম্রাটের গুরু জওক মারা যান আর তাঁর কবিতা সংশোধনের দায়িত্বও আমার ওপর ন্যস্ত হয়।

কেল্লার চাকরি

আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল। তা ছাড়া ঘরের কোণে নিঃসঙ্গ বসে থাকায় এবং আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত ছিলাম। কানে কম শুনি। তাই কদাচিৎ জনসমক্ষে হাজির হতাম। কেউ কথা বললে, আমি তার ঠোঁটের নাড়াচাড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। প্রয়োজনে সপ্তাহে দু-একবার কেল্লার বাইরে যেতাম। সম্রাট খাসমহল থেকে বাইরে এলে, কিছুক্ষণ তার সেবায় হাজির থাকতাম। না হলে দেওয়ান-এ খাসে কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে আসতাম।

এর মধ্যে লেখার কাজ যতটা শেষ হতো, তা সঙ্গে নিয়ে যেতাম, অথবা কারও হাতে করে পাঠিয়ে দিতাম। এটাই ছিল সম্রাটের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ও কাজের ধরন। কিন্তু আকাশে মেঘের ঘনঘটা আভাস দিচ্ছিল যে একটি নতুন বিপ্লব সংঘটিত হতে যাচ্ছে, আর আমার আরাম ও শান্তি, যেখানে তেমন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, ধ্বংস করে দেবে।

আকাশ এতই নির্মম ছিল যে বহু লোক অথবা শত্রু সবাই তার তরবারির বেপরোয়া আঘাতে আহত।

১১ মে ১৮৫৭

সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, সেদিন ছিল সোমবার, ১৬ রমজান, ১২৭৩ হিজরি আর ইংরেজি ১৮৫৭ সালের ১১ মে। এ দিন হঠাৎ করেই দিল্লির কেল্লার সীমানাপ্রাচীর কেঁপে ওঠে। তার প্রতিক্রিয়া চারদিকে অনুভূত হয়। আমি ভূমিকম্পের কথা বলছি না। দিনটি ছিল অত্যন্ত

অমঙ্গলজনক। মিরাট থেকে কিছুসংখ্যক হতভাগ্য ও উদ্‌ভ্রান্ত সৈন্য শহরে এসে হাজির। তারা অত্যন্ত উগ্র, নির্যাতনকারী ও দাঙ্গাকারী অকৃতজ্ঞ সেনাদল, যারা ইংরেজদের রক্ত পান করতে উদ্‌গ্রীব। শহরের বিভিন্ন ফটক বা প্রবেশপথে কর্মরত প্রহরীরা পেশাগতভাবে দাঙ্গাকারীদের সমমর্যাদার লোক; তাদের ভাই ও বন্ধু পর্যায়ের। এসব কেল্লার রক্ষক প্রহরীরা দাঙ্গাকারীদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সহমত পোষণ করে। ফলে শহর রক্ষায় তাদের যে দায়িত্ব ছিল, ভুলে যায় সে কথা। ভুলে যায় সত্য-মিথ্যা যাচাই করার ব্যাপারটিও। তারা বিনা প্রতিরোধে আগত অতিথিদের স্বাগত জানায়। এসব উগ্র ঘোড়সওয়ার আর শক্ত-সমর্থ পদাতিক সৈন্যরা দেখল, শহরের ফটক বা প্রবেশপথ উন্মুক্ত আর রক্ষকেরা তাদের বাধা দেয়নি বরং অতিথিপরায়ণ, তখন তারা পাগলের মতো কেল্লার ভেতরে নানা দিক থেকে ছোটাছুটি করে ঢুকে পড়ে। সামনে যেখানেই তারা ইংরেজ অফিসারদের পেয়েছে, হত্যা করেছে আর সম্মানিত ইংরেজদের বাড়িঘর ধ্বংস করার পর শান্ত হয়েছে।

অসহায়ত্ব ও ঘরের কোণে বসে থাকা

কিছু অসহায় ভীরু মানুষ, যারা ইংরেজ সরকারের দয়ায় রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে থাকে, তারা বসবাস করত শহরের বিভিন্ন এলাকার বাড়িঘরে। তারা শান্তিপ্রিয় আর ভীরু স্বভাবের। তারা তরবারি ও তীরের পার্থক্য বোঝে না। অন্ধকার রাতে চোরের হইচই শুনে ভয় পায়। তাদের হাতে না ছিল তীর, না ছিল তরবারি। সত্যি কথা বলতে কি, এ ধরনের লোক শহরের প্রত্যেক অলিগলিতে, অর্থাৎ সর্বত্র বসবাস করত। তাদের এমন শক্তি ছিল না যে কোমর বেঁধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। কারণ, তীব্রবেগে প্রবাহিত পানিকে খড়কুটো দিয়ে বাধা দেওয়া যায় না। তাই এ ধরনের লোকজন নিজেদের অসহায় বোধ করতে শুরু করে। প্রত্যেকে বিষণ্ন ও শোকাভিভূত হয়ে ঘরে আশ্রয় নিয়ে বসে ছিল।

এ রকমের অসহায় ও শোকাভিভূত লোকজনের মধ্যে আমিও একজন। বাড়িতে বসেই আমি বাইরের হইচই শুনতে পেয়েছি হইচইয়ের কারণ জানার চেষ্টা করে জানা গেছে, কেল্লার ভেতরে বসবাসরত ইংরেজদের প্রতিনিধি এবং কেল্লারক্ষককে হত্যা করা হয়েছে : চারদিক থেকে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের ছোটাছুটির আওয়াজ বাড়তে থাকে। ইংরেজদের রক্তে রঞ্জিত হলো মাটি। শুধু ফুলের বাগানগুলোই নয়, শহরের প্রতি ইঞ্চি জায়গা পরিণত হলো বিরান ভূমিতে। এই ধ্বংসস্তূপে সাহসীদের সমাধি রচিত হলো।

ইংরেজ হত্যায় দুঃখ প্রকাশ

হায়, দুঃখ তাদের জন্য, যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুরোধা; দুঃখ সেসব ভদ্রস্বভাবের সৎ বিচারকদের জন্য, যাঁরা আমাদের ন্যায়বিচার কাকে বলে শিখিয়েছেন; আর সীমাহীন অনুশোচনা সেসব লতানো শরীরের ইংরেজ নারীর জন্য, যাদের চেহারা পরির মতো, যাদের সুন্দর মুখ চাঁদের মতো আলো ছড়াত, যাদের দেহ ছিল বাঁকা চাঁদের মতো। দুঃখ সেসব ইংরেজ শিশুর জন্য, যারা পৃথিবীর কিছুই দেখেনি, যাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখের বিভায় গোলাপ পর্যন্ত লজ্জা পেত, যাদের ছোটাছুটির ভঙ্গির কাছে হরিণ ও পাখিদের গতিভঙ্গিও ম্লান হয়ে যেত। তাদের প্রত্যেকের রক্তাক্ত মৃতদেহ কেল্লার ভেতর পড়ে আছে, রক্তের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণের মতো সেই মৃত্যু, অগ্নিশিখা যার পুঁজি, তাদের হাতে মানুষ বেদনাহত হতে থাকে আর দুঃখের লেবাস পরতে বাধ্য হয়। এসব নিহত মানুষের শিয়রে বসে আহাজারি করা আর দুঃখ-বেদনায় কালো পোশাক পরাই রীতি। যদি আকাশ এই শোকে মেঘের মতো শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, আর মাটির বুক এই দুঃখে ঘূর্ণিঝড়ের ধুলোর মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে, সেটাই হবে সঠিক কাজ।

হে বসন্তকাল, বলির প্রাণীর রক্তের মতো মাটি ও রক্তে মিশে যাও। হে সময়, অন্ধকার রাতের মতো অন্ধকারে ডুবে যাও। হে সূর্য, এই

বেদনায় নিজের চেহারাকে নীলবরণ ধারণ করাও; আর হে চাঁদ, এই দুঃখ-বেদনা দিয়ে যুগের হৃদয়ে রেখার সৃষ্টি করো।

আল্লাহর নাম জপতে জপতে কেটে যায় এই জঘন্য সময়। চারদিকে গভীর অন্ধকার ছেয়ে যায়। এই কৃষ্ণকায় নিষ্ঠুর গোপন হত্যাকারীরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় তাঁবু ফেলে। কেল্লার অভ্যন্তরে শাহি উদ্যানকে পরিণত করে ঘোড়ার আস্তাবলে এবং বাদশাহের আবাস ভবন পরিণত হয় তাদের ঘুমের জায়গায়। ধীরে ধীরে দূরবর্তী শহর থেকে খবর পাওয়া যেতে থাকে, বিদ্রোহী সৈন্যরা ব্যারাকে ব্যারাকে ঢুকে ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করেছে। বিশ্বাসঘাতকেরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দলে দলে, সৈন্য হোক বা জমিদার, তাদের সবাই একই লক্ষ্য অর্জনে কোমর বেঁধে ঐক্যবদ্ধ হয়। শুধু মানুষ হত্যা করা ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ বা কর্মসূচি ছিল না। শলার ঝাঁটার মতো কোমরটাকে তারা এমনভাবে বেঁধেছে যে তার গিঁট কেবল রক্তের ঢেউই খুলতে পারে। এ রকমেরই একটা কোমরবন্ধের মধ্যে জোটবদ্ধ হয়েছে অগণিত যুদ্ধবাজ।

বিদ্রোহীদের নিন্দা

ভারতের লোকজনের জীবন থেকে আরাম-আয়েশ যেন চিরদিনের জন্য বিদায় করার ব্যবস্থা করা হয়। এর উৎসটা কোথায়, সেটা খুঁজতে গিয়ে এক মুঠো ঘাস পাওয়াও দুষ্কর হয়ে পড়ে—এমন একটা ঝাঁটারই প্রয়োজন ছিল। সৈন্যদের অনেক দল বা বাহিনী তাদের সরদার ও অফিসার ছাড়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে। তোপ, গোলাবারুদ, গুলি, অর্থাৎ যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম ইংরেজদের কাছ থেকেই তারা সংগ্রহ করে। যুদ্ধের যাবতীয় কলাকৌশল যারা শিখেছিল ইংরেজদের কাছ থেকে, এখন তারা সেই তাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করার জন্য তৈরি হয়ে যায়।

হৃদয় তো লোহা বা পাথরের টুকরো নয়, একে পূর্ণ করব কী দিয়ে? চোখ তো আর দেয়ালের ছিদ্র নয় যে অশ্রু ঝরাবে না। শাসকদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা উচিত এবং ভারতকে ধ্বংস করার জন্য

রোদন করা একান্ত প্রয়োজন। শহর বিচারক ও প্রশাসকশূন্য, আল্লায় অবিশ্বাসী লোকজনে শহর পূর্ণ বাগানে মালী নেই, গাছে ফুল নেই, লুটেরার দলের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, আর ব্যবসায়ীদের পাওনা আদায়ের কোনো বালাই নেই। বাড়িঘর বিরান মনে হয় এখানে লুটতরাজে কোনো ধরনের বাধা বা নিয়ন্ত্রণ নেই চারদিকেই অরাজক পরিস্থিতি। যারা নীরবে বাড়িতে আত্মগোপন করে নিঃসঙ্গ বসে ছিল, তারা লজ্জায় কোথাও বাইরে যায় না। শান্তিপ্রিয় ও ভদ্র লোকজন ঘর থেকে বেরিয়ে বাজারে গেলে বিশটি জায়গায় নানা ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। সেই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তারা নিজেদের পরাজয় ও দুর্ভাগ্যের বর্ণনা দিতে বাধ্য হয়। লুটেরার দল দিনের বেলা নির্ভয়ে লুটতরাজে ব্যস্ত থাকে, আর রাতে রেশমি কাপড়ের বিছানায় আরামে ঘুমিয়ে কাটায়।

ভদ্র পরিবারের পতন

অনেক সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতিমান পরিবারের বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর তেল পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। অন্ধকার রাতে তৃষ্ণায় কাতর লোকজন আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর আলোর জন্য প্রতীক্ষায় থাকে। সেই আলোতে জল রাখার পাত্র আর গ্লাস কোথায়, সেটা খুঁজে বের করাই তাদের লক্ষ্য।

যুগের এই অবিচার ও বিবেকহীনতাকে কী বলে আখ্যায়িত করব? যেসব নীচু স্তরের লোকজন সারা দিন মাটি কেটে বিক্রি করে, তারা মাটিতে শোয়ার জন্য এক খণ্ড জমি পেয়েছে। আর যাদের উপস্থিতি মজলিশে গোলাপি রঙের আলো ছড়াত আর মজলিশকে আলোকিত করত, তারা এখন অন্ধকার ঘরের কোনায় ব্যর্থতা আর হতাশায় মুহ্যমান।

শহরের কোতোয়ালের (দারোয়ান) স্ত্রী ও কন্যা ছাড়া শহরের সব লাবণ্যময়ী মেয়ে আর মূল্যবান গহনাপত্র কালো ডাকাতদের দখলে। অলংকার বা গয়না দেহে পরার পর তাদের গর্ব করা আর প্রেমের

ছলনা করার বাকি ছিল। কিন্তু নব্য ধনীরা তাদের ছিনিয়ে নেয়, আর তাদের নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করে : যেসব সুন্দরী প্রেমিকা, যারা ফুলের মতো, এখন তারা অসভ্য লোকজনের প্রেমের ছলাকলায় চিত্তবিনোদন করতে বাধ্য হচ্ছে। অতীতের এসব বিত্তহীন লোকজনের বর্তমান চালচলন দেখলে মনে হবে যেন ঘূর্ণিবায়ু ঘুরপাক খাচ্ছে তাদের বাচাল স্বভাব সর্বদা নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশে ব্যস্ত। তাদের দেখে মনে হয় যেন পানির বুকে ভেসে যেতে থাকা জাঙ্গিয়া। অনেক নামজাদা বিজ্ঞ, বিদ্বান আর খ্যাতিমান লোকজনের মানসম্মান মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা কোনো ধন-দৌলত ও মান-মর্যাদা কেন, কোনো কিছুরই অধিকারী ছিল না, তারা এখন অঢেল হীরা-জহরতের মালিক। ইজ্জত-সম্মান তো তারা সমাজে পাচ্ছেই। যাদের বাপ-দাদারা অলিগলিতে বেকার ঘুরে বেড়াত, তারা বাতাসকে এখন তাদের খাদেম মনে করছে। যার মা হয়তো একদা প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে আগুন চেয়ে আনত, সে এখন সেই আগুনের ওপর খবরদারি করছে। বজ্জাত লোকজন এখন আগুন আর বাতাসের ওপর রাজত্ব করতে উদ্যত। আমরা কিন্তু উদ্বিগ্ন আর শোকাহত মানুষ, আমরা শুধু শান্তি ও নিরিবিলিতে বসবাস করতে চাই। আর ন্যায়বিচারের প্রত্যাশী।

আমার বেদনাভরা অবস্থা হয়তো তোমার কাছে একটি কাহিনির মতো মনে হবে। ঠিক আছে। কিন্তু এ কাহিনি শুনলে নক্ষত্রের চোখ দিয়েও রক্ত-অশ্রু ঝরতে শুরু করবে।

ডাক যোগাযোগের বেহাল দশা। ফলে অনেক কাজ স্থগিত হয়ে পড়েছে। ডাকহরকরার আনাগোনা বন্ধ। ডাকযোগে কোনো সংবাদ ঠিকমতো পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা কিছুটা ছিল। ডাক বিভাগের আর একটি শাখা টেলিগ্রাফ। টরেটক্কার মাধ্যমে বার্তা পাঠানো হতো। এই অস্থির ঝাঁকুনি আর টরেটক্কার ফলে টেলিগ্রাফের তারের মাধ্যমে হাজারো বার্তা বেরিয়ে আসত।

বিদ্রোহের নিন্দা

যাঁরা ধর্ম ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যাঁরা ন্যায়বিচার রক্ষায় মনোযোগী, তাঁরা চলমান ঘটনাকে এড়িয়ে চলতে পারেন না। এখন বলুন, পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওলটপালট হয়ে যাওয়া, আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদের লুট হওয়া, ডাক বিভাগীয় ব্যবস্থার অচলাবস্থা আর বন্ধুদের অবস্থা না জানার ফলে এই পরিস্থিতির জন্য মাতম করা আর অশ্রু বর্ষণ করা ছাড়া কী উপায় থাকতে পারে! অনেক নামকরা বীরপুরুষের এমন অবস্থা হলো যে তারা নিজেদের ছায়াকে পর্যন্ত ভয় পেতে শুরু করে। সিপাহিরা সম্রাট আর দরবেশ সবার ওপর শাসন করতে থাকে। এই পরিস্থিতি কি দুঃখজনক নয়? এই হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির মুখে দুই চোখ কেন অশ্রু ঝরাবে না? শোকের এই মাতমকে অভিশাপ দেওয়া, তাকে ব্যঙ্গ করা এবং অশ্রু বর্ষণ করার ঘটনাকে নিয়ে হাসি-মশকরা করা কি উচিত? এই বেদনাবহ পরিস্থিতিতে দুঃখ প্রকাশ করাকে দুর্বল ঈমান আর ধর্মের বরখেলাপ বলে মনে করা কি ঠিক?

আমি কবিতা রচনা আর লেখালেখির প্রতি কীভাবে মনোযোগ দেব, যেখানে উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে হৃদয়ের ওপর হাজারো ফোসকা পড়ে গেছে। আমার হৃদয়প্রদীপ নিভে গেছে। আর দেহের শক্তি এমনভাবে লোপ পেয়েছে যে এখন আমার সাজাপ্রাপ্তিতে দুঃখ নেই। কোনো পুরস্কারেও নেই আনন্দ।

বাদশাহের অসহায়ত্ব

অতীতের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে বিপদগ্রস্ত আমি বিছানায় বন্দী। আর এই অবস্থায় দুঃখের বিবরণ আমি আবারও শুরু করছি। সর্বপ্রথম যখন পথভ্রষ্ট বিদ্রোহী জঙ্গিরা এসে হাজির হলো, তারা যে ধন-সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, সেগুলো তারা রাজকোষে জমা দিয়ে দেয়, আর বাদশাহের প্রতি প্রকাশ করে নিজেদের আনুগত্য। চারদিক থেকে

দিল্লিতে সৈন্যদের আগমন শুরু হয়। বাদশাহ সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন। বিদ্রোহী সৈন্যরা সেনা পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়। এ অবস্থায় বাদশাহ অসহায়ত্বের শিকার হলেন। ফলে, সৈন্যরা তাঁকেও তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গেল। গ্রহণের সময় চাঁদকে যেভাবে গ্রাস করা হয়, ঠিক সেইভাবে। বাদশাহ ছিলেন চাঁদের মতো। তাঁর গ্রহণ শুরু হয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ ছিল না।

কয়েদিদের মুক্তিদান

উল্লেখ করার মতো হলেও আমি অবশ্য এ কথা উল্লেখ করিনি। এখন উল্লেখ করছি। ব্যাপারটা হলো, জঙ্গি বিদ্রোহী সৈন্যরা পথ অতিক্রম করার সময় কয়েদখানার দরজা খুলে দিয়ে সব কয়েদিকে মুক্ত করে দেয়। পুরোনো দাগি আসামিরা কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে সোজা এসে হাজির হতে থাকে বাদশাহের দরবারে এবং তাঁকে সেজদা করার পর দাবি করে বসছে বিভিন্ন এলাকার সুবেদারি। মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে আসা আনুগত্যহীন চাকর-বাকরেরা পর্যন্ত বাদশাহের আস্তানায় এসে বাদশাহের গালে চুমো খাচ্ছে, আর তাঁর কাছে তাদের হাতে সবুজ এলাকার শাসনভার তুলে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। কেউ এ কথা বলে না, আর আমিও বুঝতে পারি না যে আশ্রয়প্রার্থী এবং অভিলাষীকে কেন আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া হয়? আসলে এটাই ছিল তখনকার সময়ের এক বিস্ময়কর খেলা।

সৈন্যসংখ্যা

তখন দিল্লি শহরের ভেতর ও বাইরে প্রায় ৫০ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। এই বিশাল শহরের একমাত্র পশ্চিম দিকে মাত্র একটি পাহাড়ি এলাকা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ইংরেজ শাসকদের দখলে ছিল। এই পাহাড়ি এলাকা শহর থেকে কিছুটা দূরে। ইংরেজরা অত্যন্ত

দক্ষতার সঙ্গে এখানে একটি মজবুত সামরিক পরিখা তৈরি করেছিল আর এই পরিখার চারদিকে ড্রাগনের মতো সারি সারি তোপ বসানো হয়। তাদের প্রদর্শিত ধৈর্য ও এহেন কর্মতৎপরতার ফলে এই বেদনাময় পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায়

ইংরেজদের সামরিক ব্যূহ তৈরি

শহরের ইংরেজ সৈন্যরা যেসব আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেছিল, তার মধ্যে কয়েকটি কামান নগরপ্রাচীরের ওপর বসানো হয়। এভাবে ইংরেজরা যুদ্ধবাজ বিদ্রোহী কমান্ডারদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেদের দাঁড় করায়। বন্দুক ও তোপের গোলার ধোঁয়ায় মনে হয়, আকাশ কালো মেঘের ঘনঘটায় ছেয়ে গেছে এবং আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। রাতদিন দুই পক্ষের মধ্যে গোলাবিনিময় হয়। মনে হয়, ওপর থেকে যেন পাথর ছোড়া হচ্ছে। মে-জুন মাসে প্রচণ্ড গরম। রোদের তাপ দিন দিন বাড়ছে। সূর্য মিথুন রাশির প্রভাবে যেন আগুন জ্বালিয়ে রাখতে ব্যতিব্যস্ত। মনে হয়, সূর্য নিজেও এই আগুনে জ্বলেপুড়ে খাক হচ্ছে। যারা শীতল বাতাসে বাড়িতে আরাম-আয়েশে বসবাস করত, এখন সারা দিন তারা সূর্যের তাপে জ্বলছে আর রাতেও তারা বসবাস করছে উত্তপ্ত পাথরের তাপের মধ্যে। ইরানের শাহ ইসফান্দিয়ার যদি যুদ্ধের ময়দানে এই গরমের স্পর্শ পেতেন, তাহলে তাঁর বীরত্ব আর দেহের যৌবনের শক্তি-সাহস সবই উবে যেত; রুস্তম যদি এই কাহিনি শুনতেন, তাহলে তাঁর প্রাণপাখি উড়ে যেত। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিদ্রোহী সৈন্যরা সারা দিন সাহসী বীর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত আর সূর্য ডোবার আগেই ঘাঁটিতে ফিরে আসত। শহরের আশপাশে প্রতিদিনই এমনটা ঘটত। শহরের ভেতরে কী ঘটছে, তার বিবরণ অবশ্যই শোনার মতো।

আমার বাদ্যযন্ত্রের তারে এমন সংগীত সুপ্ত আছে, যেখান থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হয়। আমার ভয় হয়, পাছে গায়ক এর কবলে না

পড়েন! আর আমার কাছে এমন কাহিনি আছে, যার ফলে আমার বুকে তরবারি বিদ্ধ হতে বাধ্য।

একজন লোক, যার কল্পনা প্রভুভক্তি ও গর্ববোধের ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন, সে তার অজান্তে নিজের প্রভু ও মুরব্বিদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তাদের ধারণা, 'যদি এই অভিজ্ঞ আর গোপন ব্যাপারস্যাপার জানা লোকটি জীবিত থাকে, তাহলে তারা যে সম্পদ (অবৈধভাবে উপার্জিত) অর্জন করেছে, সে-সংক্রান্ত গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে।' সর্বদা তাঁরা অন্যের ক্ষতির ভাবনায় ব্যস্ত থাকেন, আর এ কথা প্রচার করা হয় যে 'হাকিম আহসান উল্লাহ খান ইংরেজদের সমর্থক আর হিতাকাঙ্ক্ষী।' ঠিক এভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্যরা সেনা অফিসারদের উসকে দিতে থাকে।

হাকিম আহসান উল্লাহ খান

একদিন কিছু লোক হাকিম আহসান উল্লাহ খানকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়। হাকিম সাহেব তখন কেল্লায় বাদশাহের সাহচর্যে ছিলেন। কিছু উচ্ছৃঙ্খল সৈন্য কেল্লার ভেতরে গিয়ে হাকিম সাহেবকে ঘেরাও করে। বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর হাকিম সাহেবকে রক্ষা করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালান এবং সারাক্ষণ ভালোবাসার সুরে কথা বলে ও অনুনয়-বিনয় করে তাদের রাগ পানি করেন। নত করান তাদের। ফলে হাকিম সাহেব প্রাণে রক্ষা পান। কিন্তু তার বাড়িতে লুটপাট শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বিবাদ-বিসম্বাদের ইতি টানা হয়নি। হাকিম সাহেবের মহল ছিল সুসজ্জিত ও মনোরম, ঠিক শান্তি কুটিরের মতো। সেখান থেকেই বিদ্রোহী সৈন্যরা মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। তারপর সেই বাড়ির ছাদে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ছাদের নকশাদার কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দেয়ালে এমনভাবে কালো দাগ পড়ে যায় যে দেখে মনে হয়, যেন বাড়িটি শোকের কালো পোশাক পরেছে।

আকাশের দয়ায় ধোঁকা খাবেন না এই অবাধ্য লোককে যে ভালোবেসে বুকে ঠাঁই দেয়, সে উদ্বেগ আর দুঃখ-বেদনার শিকার হয়।

অত্যন্ত নিকৃষ্ট ভৃত্যও নিজের মনিবের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে না এই অসভ্য-অকৃতজ্ঞ লোকটির মুখে বসন্তের দাগ। নির্লজ্জপনার জন্য তার চোখ দুটো এমনভাবে বিস্ফারিত, দেখে মনে হয়, যেন জলপাত্রের মুখ প্রশস্ত হয়েছে। সে নিজেকে শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহের মতো সুন্দর মনে করে। চারদিকে নিতম্ব দুলিয়ে অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়ে চলাফেরা করে। তার নিজের মনোরম চালচলন ও দেহভঙ্গিমায় চকোরী পর্যন্ত লজ্জা পায়। এখানে আমি তার নাম উল্লেখ করছি না। কারণ তার নাম তেমন পরিচিত ছিল না; আমি তাকে অভিশাপ দিয়ে যে কাহিনি বলতে শুরু করেছিলাম, আবারও তা শুরু করছি।

তোফাজ্জল হোসাইন খান

বিদ্রোহী সৈন্যরা চারদিক থেকে এসে জমায়েত হচ্ছে। এই বিদ্রোহের সঙ্গে যেহেতু সম্রাটের নাম জড়িত, তাই দূর-দূরান্তের সৈন্যদের কমান্ডাররাও সজাগ হয়ে ওঠে। ফররুখাবাদের খ্যাতনামা কমান্ডার ছিলেন তোফাজ্জল হোসাইন খান। সম্রাটের প্রতি তাঁর কোনো ধরনের আনুগত্য ছিল না, ছিল না কোনো ধরনের যোগাযোগও। তিনি দূর থেকে শাহি আস্তানার প্রতি কুর্নিশ জানান আর চিঠি লিখে নিজেকে পুরোনো পরিচিত লোক বলে দাবি করেন।

খান বাহাদুর খান

পথভ্রষ্ট খান বাহাদুর খান নিজের খ্যাতির প্রত্যাশী। বেরিলিতে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে কমান্ডার হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। তিনি সম্রাটের দরবারে এক শ স্বর্ণমুদ্রা, ঢোলবাদ্যাদির মতো কিছু সরঞ্জামের পাশাপাশি সুসজ্জিত হাতি ও ঘোড়া পাঠান।

নবাব ইউসুফ আলী খান

রামপুরের ক্ষমতাসীন শাসক নবাব ইউসুফ হোসাইন খান বাহাদুর। পিতা-প্রপিতামহের আমল থেকে নবাবের আসনে সমাসীন। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। হাজার বছরেও এ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ছিল না। বাধ্য হয়ে সম্রাটের কাছে তাঁর মৌখিক বাণী পাঠিয়ে জনগণের সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দেন।

লক্ষ্ণৌর ঘটনা

লক্ষ্ণৌর সৈন্যরা ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। ইংরেজরা এই আগুনের হাত থেকে প্রাণে বাঁচার জন্য অন্য জায়গায় থাকা তাদের পরিবারভুক্ত সদস্যদের কাছে চলে যান কিন্তু কয়েকজন বিদ্রোহী সেনা কমান্ডার দলবল নিয়ে বেলি গার্দে অবস্থান নেয়। এটা ছিল লক্ষ্ণৌয়ের একটা বিখ্যাত জায়গা। তারা সাহসিকতার সঙ্গে শহরের সব কটি প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেয়।

শরফউদ্দৌলা অত্যন্ত জ্ঞানী, পরিস্থিতি বোঝার মতো প্রখর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি অযোধ্যার বিভিন্ন নবাবের আমলে মন্ত্রীর দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। কিন্তু প্রতিপত্তিবান স্বল্প কিছু লোক ইংরেজদের তোয়াক্কা না করে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের দশ বছরের সন্তানকে অযোধ্যার নবাবের আসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং তাঁকে ভারতের সম্রাটের মন্ত্রী আর নিজেকে (শরফউদ্দৌলা) ম্যানেজার এবং নায়েবে উজির পদে আসীন হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই বিখ্যাত ব্যক্তি (শরফউদ্দৌলা) প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা নিজের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছিলেন। সব ধরনের প্রশাসনিক কাজকর্ম শেষ করে একজন মনোনীত ব্যক্তিকে যথাযথ উপঢৌকনসহ দিল্লি পাঠানো হয়। দূত দিল্লি এসে দুই দিন বিশ্রাম নেন। তারপর শাহি দরবারে হাজির হন। দুটি দ্রুতগামী ঘোড়া, দুটি পাহাড়সমান হাতি, এক শ একুশটি স্বর্ণমুদ্রা, একটি সোনালি বাদশাহি

তাজ, যাতে রং-বেরঙের দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান মুক্তার পাথর বসানো ছিল—বাদশাহের হাতে তুলে দেন। এক জোড়া হীরাখচিত বাজুবন্ধও সম্রাজ্ঞীর কাছে মহলের অভ্যন্তরে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়

এসব শান-শওকত আর ঐশ্বর্য প্রদীপের আলোর মতোই (শিগগিরই শেষ হবে) ছিল। ছিল কালের কুদৃষ্টির জন্য আলোর প্রতীক্ষায় অযোধ্যা সরকারের উপহার পৌছানোর পর বিদ্রোহী সৈন্যদের উত্থান ও হইচইয়ের ফলে তাদের ভাগ্যের দরজা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আবার তা রুদ্ধ হয়ে যায়। না না, সম্রাটের ভাগ্যের নক্ষত্র এতটাই উঁচুতে গিয়ে পৌছেছিল যে তা পৃথিবীর মানুষের চোখের আড়ালে চলে যায়। আলেকজান্ডারের শৌর্যবীর্য আর বাদশাহ জামশিদের পানপাত্রের কাহিনি শেষ হয়ে যায় (পারস্যের নৃপতি এমন একটি পানপাত্র তৈরি করেছিলেন, যাতে পুরো পৃথিবীর হাল-হকিকত দৃশ্যমান হয়ে উঠত)।

যখন ভাগ্যনক্ষত্রে বিরূপ ভাব দেখা দেয়, তখন মাথার মুকুটের কোনো মূল্য থাকে না, তোমরা দেখতে পাও না পরিবর্তনের ভয়ে সূর্য আকাশে কীভাবে কাঁপতে থাকে!

১৪ সেপ্টেম্বর

যেদিন ওই কুচক্রীরা এল আর সম্রাট তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখালেন, তার পরদিন রোববার ছিল চাঁদের চব্বিশ তারিখ। ছিল সেপ্টেম্বর মাসের চৌদ্দ তারিখ। পাহাড়ি উপত্যকায় অপেক্ষারত ইংরেজ সৈন্যরা কাশ্মীরি ফটক তথা প্রবেশদ্বারে প্রচণ্ড হামলা চালায়। ফলে কালো (বিদ্রোহী) সৈন্যরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

মে মাসে দিল্লি থেকে ন্যায়বিচার উধাও হয়ে যায়। সেপ্টেম্বরে আবার অত্যাচার-অবিচারের যুগ শেষ হয়ে ফিরে আসে সুবিচারের যুগ। চার মাস চার দিন পর সগর্বে সূর্য উদিত হয়। দিল্লি শহর উন্মাদশূন্য হয়ে পড়ে। বুদ্ধিমান (ইংরেজরা) বীরত্বের সঙ্গে পুনরায় দিল্লি শহর দখল করে নেয়।

১১ মে থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার মাস চার দিন দিল্লি শহর ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। এক রোববারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল, আবার আরেক রোববারেই শহর তাদের দখলে চলে আসে। আমরা অবশ্য বলতে পারি, শহরের নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়া এবং আবারও তা দখলে আসার কাজটি একই দিনে হয়েছিল। মোদ্দা কথা, বিজয়ী সৈন্যরা সামনে যাকে পেয়েছে, প্রকাশ্যে হত্যা করেছে শহরের অভিজাত পরিবার এবং সম্মানিত লোকজন তাদের মান-ইজ্জত ও সম্পদ রক্ষার জন্য ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। শহরে অসভ্য আত্মগোপনকারী যেসব বিদ্রোহী সৈন্য ছিল, তাদের মধ্যে কিছু সদস্য পালিয়ে যায়, আর কিছু সৈন্য গর্বে বুক টান করে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ভবঘুরে এবং ভ্রষ্ট লোকজনের এই দল প্রবল প্রতাপশালী সাহসী ও বিজয়ী নক্ষত্রদের (ইংরেজ) সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদের ধারণা, তারা শত্রুদের হত্যা করেছে। কিন্তু আমার মতে, তারা শহরের ইজ্জত আর সম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

দুই-তিন দিন যাবৎ কাশ্মীরি দরওয়াজা থেকে চক পর্যন্ত পুরো রাজপথ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। দিল্লি দরওয়াজা, তুর্কম্যান দরওয়াজা ও আজমিরি দরওয়াজা—এই তিন দরওয়াজা তাদের দখলে ছিল আমার মতো দুর্বল হৃদয়ের অধিকারীর বাড়ি শহরের কাশ্মীরি দরওয়াজা এবং দিল্লি দরওয়াজার মাঝামাঝি অবস্থানে ছিল। আমার বাড়ি থেকে এই দুই দরওয়াজার দূরত্ব ছিল সমান। গলির দরওয়াজা ছিল বন্ধ; তবুও সাহসভরে দরওয়াজা খুলে বাইরে চলে যেতাম আর আহারসামগ্রী সংগ্রহ করার পর ঘরে ফিরে আসতাম।

ইংরেজদের বিজয় ও অত্যাচার

আমি আগেই বলেছি, ইংরেজরা ভয়ংকর বাঘের মতো শহরে প্রবেশ করেই নিরস্ত্র-নিরীহ লোকজনকে হত্যা এবং তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে

দেওয়াকে বৈধ মনে করে। অবশ্য যে এলাকায় তারা যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করে, বাড়িঘর দখল করে, সেখানেই এ ধরনের নির্মমতা ও অত্যাচার চালানো হয়। এ ধরনের ক্রোধ ও শত্রুতা দেখে লোকজনের মুখ শুকিয়ে যায়। অসংখ্য নারী-পুরুষ দলে দলে এই তিন দরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে মামুলি লোকজনও ছিল। ছিল অভিজাত বংশের লোকজনও। তারা দলে দলে বেরিয়ে শহরের বাইরে ছোট ছোট বস্তি ও সমাধিস্থলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাদের ধারণা ছিল, পরিস্থিতি অনুকূল হলে তারা আবারও শহরে ফিরে আসবে, নয়তো অন্য কোনো শহরে চলে যাবে।

আমার মনে ভয়ভীতির কোনো প্রভাব পড়েনি এবং ধৈর্যচ্যুতিও ঘটেনি আমি অপরাধী নই যে সাজা পাব। ইংরেজরা তো নিরপরাধ লোককে হত্যা করে না। শহরের পরিস্থিতিও তেমন একটা ভালো নয়। আমার মনে এ ধরনের বাজে চিন্তা কেন স্থান দেব, আর এদিক-সেদিক পালিয়ে বেড়াব!

বাড়িতে এখন কাঙালের মতো বসে আছি। এই নিঃসঙ্গতায় কলমই আমার বন্ধু। দুই চোখ দিয়ে পানি ঝরছে এবং কলম দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে বেদনাসিক্ত শব্দ।

আমি একজন পুরোপুরি ভিখারি আর সহায়-সম্বলহীন লোক। খোদাবন্দ, আর কত দিন এ কথা ভেবে ভেবে খুশি থাকব যে এই মণিমুক্তা (দিনলিপি) আমার কানে শোনা কাহিনি। ভাগ্যের লিখন বদলায় না। ভাগ্যে কী আছে, সেটা লেখা হয়ে গেছে। প্রত্যেকের ভাগ্যে যা লেখা আছে, সে মোতাবেক তাদের ধন-সম্পদ দেওয়া হয়। বিপদ-আপদ আর আরাম-আয়েশ সব কপালের লিখন। অতএব আমি উদাসীন, সংসারবিমুখ মানুষ। ভয়ভীতি ভুলে যেভাবে বেঁচে আছি, সেভাবে বেঁচে থেকে আনন্দের সঙ্গে তামাশা দেখতে থাকাকেই শ্রেয় মনে করি। যুগের প্রতিটি মুহূর্ত বদলে যাচ্ছে। বৃদ্ধ বয়সে এই অভাবনীয় কৌতুক মনের আনন্দে দেখতে থাকি।

১৮ সেপ্টেম্বর

জুমার দিন ২৬ মহররম, ১৮ সেপ্টেম্বর। দিনের আলোর পৃথিবীকে আনন্দদানকারী সূর্য গতিপথ প্রদক্ষিণ করে এমন জায়গায় পৌঁছায়, যেখানে সূর্যগ্রহণের ফলে চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে যায়। পথভ্রষ্ট বিদ্রোহীরা শহরের ভেতর ও বাইরে থেকে শুয়োরের পালের মতো পালাতে থাকে, আর বিজয়ীরা (ইংরেজ) শহর ও কেল্লা দখল করে নেয়। ধরপাকড় আর হত্যাকাণ্ডের বিপদ এই গলিকেও স্পর্শ করে। ভয়ে লোকজনের হৃৎকম্পন শুরু হয়।

গলি তালাবন্ধ

এ গলিতে মাত্র দশ-বারোটি বাড়ি ছিল, আর বের হওয়ার ছিল একটিমাত্র পথ। গলি ভেতর থেকে বন্ধ। গলিতে কোনো কুয়ো ছিল না। এখানকার বেশির ভাগ অধিবাসী অন্য কোথাও চলে গেছে। মহিলারা শিশুদের বুকে জড়িয়ে ধরে ছিল, আর পুরুষদের মাথার ওপর বাড়ির মালামালের পোঁটলাপুঁটলি। কেবল আমরা কিছু লোক বাড়ি ছেড়ে যাইনি। আমরা সবাই মিলে গলির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছি এবং গেট আটকে দিয়েছি পাথরচাপা দিয়ে। গলি এখন সুরক্ষিত। পাশে একটিমাত্র পথ ছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল।

আমার হৃদয় দেহের চেয়েও বেশি রিক্ত এবং অসহায় বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ, আমার হৃদয় জেলের কোটরের চেয়ে বেশি অপ্রশস্ত।

মহারাজা পাতিয়ালার সহায়তা

ঘটনাক্রমে এই বিপদে সাহায্য পাওয়ার একটা উপায় খুঁজে পাওয়া গেল। পাতিয়ালার মাহারাজা রাজা নরেন্দ্র সিং বাহাদুর বিজয়ী ইংরেজদের পক্ষে ছিলেন এবং পাতিয়ালার সৈন্যরা প্রথম থেকেই

ইংরেজ সৈন্যদের সহায়তা করে এসেছে। মহারাজার প্রশাসনে দিল্লি শহরের কয়েকজন খ্যাতিমান এবং সম্মানিত ব্যক্তি উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। এঁরা হলেন হাকিম মাহমুদ খান, হাকিম মুর্তজা খান ও হাকিম গোলাম উল্লাহ খান (হাকিম শরিফ খানের ছেলে)। এ গলিতেই তাঁরা বসবাস করতেন। অনেক দূর পর্যন্ত তাঁদের বসবাসের প্রাসাদ বিস্তৃত ছিল। আমি দশ বছর যাবৎ এঁদেরই একজনের প্রতিবেশী। এই তিনজনের মধ্যে হাকিম মাহমুদ খান তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে এই গলিতে বসবাস করতেন। ওপরে উল্লেখ করা অবশিষ্ট দুজন পাতিয়ালা মহারাজার সাহচর্যে বন্ধুত্বের পরিবেশে সাফল্যে ভরা জীবন যাপন করছিলেন। দিল্লি বিজয় ছিল আসন্ন। মহারাজা শক্তিশালী ও যুদ্ধবাজ ইংরেজদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অনুমোদন নিয়ে নেন যে দিল্লি বিজয়ের পর গলির দরওয়াজায় প্রহরী নিয়োগ করা হবে, যাতে ইংরেজ সৈন্যরা (যাদের গোরা বলা হয়) গলির ভেতরের বাড়িঘরের ক্ষতি সাধন করতে না পারে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় আলোচনা না করে পারা যায় না। প্রাসঙ্গিক এই কথার পর আবার মূল বিষয়ে ফিরে যাব। ১৫ সেপ্টেম্বর সারা শহরের প্রতিটি বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। দোকানদার ও গ্রাহকদের প্রত্যেকেই উধাও। গম কেনার গ্রাহক পর্যন্ত নেই। কাপড় ধোয়ার ধোপাও গায়েব হয়ে গেছে। মাথার চুল কাটার জন্য নাপিত নেই। ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ঝাড়ুদার পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অবশ্য আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে এই পাঁচ দিন গলির বাইরে গিয়ে নিয়মিত আমি পানি নিয়ে আসতাম। মাঝেমধ্যে আটাও পাওয়া যেত। কিন্তু এর পরপরই পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়ে। গলির ফটক-পথ পাথরচাপা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। হৃদয়ের আয়না দুঃখ-বেদনার কুয়াশার অন্ধকারে ছেয়ে গেছে।

চেষ্টার ত্রুটি হয়নি, কিন্তু তার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। এখন বিপদ-আপদ রক্তে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো করে জ্বালাতন করতে শুরু করছে।

পানি ও গমের অভাব

বাড়িতে যে আহারসামগ্রী ছিল, ক্রমশ তা নিঃশেষ হয়ে যায় অত্যন্ত হিসাব করে পানি পান করা হচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলসি অথবা মৃৎপাত্রে এক ফোঁটা পানির অস্তিত্ব নেই। নারী-পুরুষ কারোরই আর সহ্য করার মতো শক্তি নেই। ধৈর্য ধরে দিন কাটানো এবং আহারসামগ্রী সংগ্রহ করার কথা বলে মনকে ধোঁকা দেওয়ার দিন শেষ। দুই দিন দুই রাত যাবৎ বাড়ির সবাই ভুখা আর তৃষ্ণার্ত। হায়, এই হাহাকার আর লোকের কাছে অভাবের তাড়নায় হাত পাতার দুর্গতি এবং অসহায়, বিপন্ন ও সহায়-সম্বলহীন এই অবস্থার জন্য অফুরন্ত আফসোস ছাড়া আর কীই বা প্রকাশ করতে পারি!

আগেই উল্লেখ করেছি, তৃতীয় দিন পাতিওয়ালার মাহারাজার সৈন্যরা এসে হাজির। এসেই তারা গলিতে পাহারা দিতে শুরু করে। ফলে গলিতে থাকা লোকজন লুটতরাজের আশঙ্কা থেকে মুক্তি পায়। প্রহরীদের কাছ থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া হলো। তারা বলল, চকের বাজার পর্যন্ত যাওয়া যাবে, তার বাইরে গেলে খুনখারাবি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে পড়তে হবে। সেখানকার রাস্তাঘাটে যাওয়াটা নিরাপদ নয়।

অসহায় ও বিপন্ন লোকজন দরওয়াজা খুলে দেয়। ভিস্তি অথবা মশক পাওয়া দুষ্কর। তাই প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজন পুরুষ এবং আমার বাসার কর্মচারীদের মধ্যে দুজনকে পানি আনার জন্য বাইরে পাঠানো হলো। মিঠাপানি পাওয়া যায় অনেক দূরে। অত দূর যাওয়া সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে আধা লবণাক্ত পানি মটকা আর কলসিতে ভরে তারা নিয়ে আসে। এই লবণাক্ত পানি খেয়ে পেটের আগুন নেভানো হলো, যার অপর নাম তৃষ্ণা। বাইরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং যারা পানি এনেছে, তাদের কাছ থেকে শুনেছি, এই গলির পর যেখান থেকে আগে যাওয়া নিষিদ্ধ, সিপাহিরা সেসব জায়গার কিছু বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এসব বাড়িতে বস্তায় আটা আর পাত্রে তেলটেল কিছুই পাওয়া

যায়নি। আমি বললাম, যারা ভালো মানুষ, তারা থালা, বস্ত্র, আটা আর তেলের কথা বলে না। আমাদের রুজির ব্যবস্থা তো সৃষ্টিকর্তাই করবেন। তিনি তো আমাদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। খোদার দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা শয়তানের কাজ।

ইদানীং আমরা নিজেদের কয়েদি মনে করি। আসলেও তা-ই, আমরা কয়েদিদের মতো জীবন যাপন করছি। লোকজন কেউ বাড়িতে আসে না। আমাদের কথা শোনারও কেউ নেই। বাইরে গিয়ে নিজের চোখে পরিস্থিতি দেখার সুযোগ নেই। আসলে আমাদের কান বধির আর দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে খাওয়ার জন্য রুটি আর পানি পর্যন্ত নেই।

একদিন হঠাৎ বৃষ্টি হলো। আমি উঠোনে একটা চাদর টাঙিয়ে তার নিচে একটা বড়সড় মাটির মটকা রেখে দিই। এভাবে পানি সংগ্রহ করি। প্রচলিত কথা, মেঘ সমুদ্র থেকে পানি চুষে নিয়ে পৃথিবীর বুকে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করে। কিন্তু এবার মেঘ ঝরনা থেকে পানি সংগ্রহ করেছে। আলেকজান্ডার তাঁর শাসনামলে যে বস্তুর অনুসন্ধান করতেন, আমি এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে সেই সম্পদ অর্থাৎ অমৃত (আবেহায়াত) খুঁজে পেলাম। হে গালিব, বন্ধুদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কার্পণ্য করা হয়নি। অবশ্য সৃষ্টিকর্তা এমনভাবে কাজ সমাধা করেন যে আমরা তার কিছুই বুঝতে পারি না।

গালিবের জীবনচরিত

এই সুযোগে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে কিছু লিখতে চাই, যাতে এই জীবনকথা রচনায় ধারাবাহিকতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে না পড়ে।

আমি নতুন দাগের মাধ্যমে হৃদয়ের ক্ষতগুলোতে মলমের প্রলেপ লাগাচ্ছি আর ফোড়া বিদারণের যন্ত্রের মাধ্যমে হৃদয়ে গেঁথে থাকা বর্শার ফলক টেনে তুলছি।

এ বছর আমার জীবনের বাষট্টি বছর পূর্ণ হলো। এই দীর্ঘ সময় ধরে আমি পৃথিবীর বুক চষে বেড়াচ্ছি। আর পঞ্চাশ বছর যাবৎ কবিতা রচনা ও কাব্যচর্চায় ব্যস্ত আছি। আমার বয়স যখন পাঁচ বছর, আমার বাবা আবদুল্লাহ বেগ খান বাহাদুর মারা যান। খোদা তাঁর আত্মার প্রতি সীমাহীন রহমত নাজিল করুন। আমার চাচা নসরুল্লাহ বেগ খান বাহাদুর আমাকে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে ছেলের মতো লালনপালন করেন। আমার বয়স যখন নয় বছর, তখন আমার অভিভাবক চাচার মৃত্যু হয়। ফলে আমার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে।

আমার প্রশংসার যোগ্য মহান ও মর্যাদাবান গুরুজন (চাচা) নসরুল্লাহ বেগ চার শ অশ্বারোহীর সরদার এবং জেনারেল লর্ড লিক বাহাদুরের অনুরক্ত কর্মকর্তা ছিলেন। আমার সাহসী এই চাচার হাতে জেনারেল লিক আগ্রার কাছাকাছি ভরতপুরে দুটি পরগনার দায়িত্ব তুলে দেন। এ দুই পরগনার পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক ছিলেন তিনি। আয়ের উৎস ছিল বার্ষিক ব্যক্তিগত পেনশন ও জায়গির থেকে পাওয়া অর্থ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর মৃত্যুর পর ইংরেজরা দুটি পরগনা ফেরত নিয়ে নেয়। এই জায়গিরের পরিবর্তে আমাকে ও আমার ছোট ভাইয়ের জন্য বার্ষিক পেনশন ধার্য করা হয়। ফলে আমাদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লির কালেক্টর অফিসের রাজস্ব বিভাগ থেকে এই পেনশন পেয়েছি। মে মাস থেকে অর্থপ্রাপ্তির এই দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আবার আমি দুর্ভাগ্যের শিকার হলাম। মনে নানা ধরনের অসহায়ত্বের একটা বোধ আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

এর আগে আমার স্ত্রী ছাড়া সঙ্গে আর কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। একমাত্র স্ত্রীই আমার সঙ্গে ছিল। প্রায় পাঁচ বছর আগে আমি আমার স্ত্রীর (আমার বিড়ম্বনার জন্য দায়ী) পরিবার থেকে দুজন অনাথ ছেলেকে এনে লালনপালন করতে শুরু করি। এই মিষ্টভাষী শিশুদের প্রতি ছিল আমার সীমাহীন দরদ ও ভালোবাসা। আমার এ অসহায় অবস্থার মধ্যেও শিশু দুটি আমার সঙ্গে ছিল, আর এরা ছিল আমার জামার কলারে ফুলস্বরূপ।

মির্জা ইউসুফ

আমার ভাই ইউসুফ বয়সে আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট। সে ত্রিশ বছর বয়সে পাগল হয়ে যায়। এরপর সে কাউকে বিরক্ত করত না, হইচই করত না। তার বাড়ি আমার বাড়ি থেকে ছিল দুই হাজার গজ দূরে। তার স্ত্রী, তার মেয়ে, চাকরবাকর ও সন্তানসন্ততি নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া নিরাপদ মনে করে। বাড়ির আসবাবপত্র বাড়ির মালিক, একজন বৃদ্ধ দারোয়ান এবং বৃদ্ধা চাকরানির হাতে তুলে দিয়ে যায়। এ অবস্থায় আমি জাদু জানলেও কাউকে পাঠিয়ে এই তিনজনকে ডেকে আনা এবং তাদের মালামাল সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। এটা সত্যিই বেদনাদায়ক এবং আমার মনে এর দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়।

আমার পালিত ছেলে দুটি ফল, দুধ আর মিষ্টি খেতে চায়। কিন্তু তাদের ইচ্ছা পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। হায় ভাগ্য, এ দুঃখকে কী বলব! বেঁচে থাকলেও রুটি ও পানির চিন্তায় থাকি আর মৃত্যুর পর দাফনকাফনের চিন্তা আমাকে ছাড়তে চায় না। আমার ভাই দিনে কী খেল, আর রাতে কীভাবে ঘুমায়—দিনরাত আমার এই এক চিন্তা। পরিস্থিতি এমন যে আমার ভাই জীবিত আছে, নাকি দুঃখ-বেদনা সইতে সইতে মারা গেছে, কেউ সে কথা জানে না। আমার ঠোঁটে শুধু আহ্ শব্দের গোঙানি নেই, খোদার শপথ করে বলছি, এই দুঃখ-বেদনায় আমার প্রাণ একেবারেই ওষ্ঠাগতও।

যে অবস্থা আমি বর্ণনা করেছি, তা সত্যিই হৃদয়বিদারক বটে। কিন্তু যা কিছু আমি বলতে পারিনি, তা প্রাণহারকও বটে। যাঁরা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জানেন, তাঁরা আমার পুরো কাহিনি শুনবেন বলে আমি ভরসা রাখি। সবকিছু শুনে তাঁরা সুবিচার করবেন।

রানি ভিক্টোরিয়ার প্রশংসায় কাসিদা রচনা

বৃদ্ধ বয়সে আমার অবস্থা সকালের প্রদীপ আর অট্টালিকার অলিন্দে বিকেলে পড়া সূর্যের আলোর মতো। এ কথার আসল মর্মটা এই যে

প্রদীপের আলো আর সূর্যের আলোর বিকিরণে নয়, বরং সকালে যেমন প্রদীপের তেল শেষ হওয়ার উপক্রম হলে আলো হালকা হয়ে আসে, আর দিনের শেষে যেমন সূর্যের আলো বিবর্ণ হয়ে আসে, আমার অবস্থাও তাই। দুই বছর হলো আমি সুবিচারক, চোখের মণি রানি ভিক্টোরিয়ার স্তুতি গেয়ে একটি কাসিদা (প্রশংসাসূচক কবিতা) লিখেছি। সে সময় ডাকযোগে চিঠিপত্র দিল্লি থেকে মুম্বাই এবং সেখান থেকে লন্ডন গিয়ে পৌঁছাত। আমি লর্ড অ্যালেন বরা বাহাদুর বরাবর এই কাসিদা দিল্লিতে পাঠিয়ে দিই। তিনি গভর্নর থাকার সময় আমার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ফার্সিতে লেখা এই স্তুতিমূলক কবিতার দুই লাইনের অনুবাদ নিম্নরূপ :

'আমি আলোচনার দ্বার খুললাম
এই ভাগ্য যদি আমার না হয়
ধরণীর নারীদের উৎসবে আমাকে
ঠিকানা খুঁজে দেবে।'

এই লাইন দুটি ওই কাসিদার অংশবিশেষ। এটি মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। মনে করেছিলাম, এই দুরূহ কাজ সহজে সমাধা হবে। তিন মাস পর হঠাৎ একজন বার্তাবাহক লর্ড অ্যালেন বরার পৃষ্ঠপোষকতাপূর্ণ চিঠি নিয়ে হাজির। চিঠিটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ভাষায় দেওয়া জবাবে তিনি লিখেছেন, আমার কবিতা তাঁর কাছে পৌঁছেছে। তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি আপনার কবিতা সম্মানীয় রানির কাছে পেশ করার জন্য শাহি দরবারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠিয়েছি।' এই আনন্দময় বার্তা এবং অভিনন্দনযোগ্য উত্তর পাওয়ার পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়েছে। দয়ালু কমান্ডার মি. রেজিংটনের চিঠি ডাকযোগে পেলাম। তিনি লিখেছেন, 'সেই কাসিদা লর্ড অ্যালেন বরার মাধ্যমে তাঁর কাছে

পৌঁছেছে এ ব্যাপারে নির্দেশিত হয়ে জানাচ্ছি যে আপনার আবেদন নিয়মকানুন অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতবর্ষের সর্বময় শাসকের মাধ্যমে আমার কাছে পাঠান।'

গালিবের তিনটি দাবি

নির্দেশ মান্য করে আমি ইংল্যান্ডের সম্রাজ্ঞীর কাছে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের মাধ্যমে একটি প্রার্থনাপত্র পাঠিয়ে দিই। আরজিতে আমার প্রত্যাশা এভাবে পেশ করি: রোম, ইরান এবং অন্যান্য দেশের সম্রাটরা কবি ও তাঁদের প্রশংসাকারীদের নানা ধরনের উপহার দিয়ে খুশি করতেন, মণিমুক্তা ও স্বর্ণ উপহার দিতেন, গ্রামের নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ করতেন। দিতেন আরও নানা ধরনের উপহার। এরও নানা রকম পদ্ধতি আছে। একজন প্রশংসাকারী হিসেবে আমার প্রত্যাশা, সম্রাজ্ঞী নিজের জবানিতে আমাকে খেতাব দেবেন, আপন নির্দেশে উপহার দেবেন এবং আহারের জন্য কয়েক টুকরো রুটিও দেবেন। এখানে রুটির টুকরো বলতে ইংরেজিতে পেনশন বোঝানো হয়েছে।

মহান বিচারক নবাব গভর্নর জেনারেল বাহাদুর আমার প্রার্থনার বিষয় এবং আমার বেদনাতুর হৃদয়ের মর্মার্থ বুঝতে পেরে তাঁর উত্তরে জানান যে আমার প্রার্থনাপত্র ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছে। এই আনন্দসংবাদ পাওয়ার পর আমার আনন্দে আত্মহারা হওয়ার উপক্রম হয়।

হতাশাপূর্ণ উত্তর

দীর্ঘ চার মাস পর মি. রাসেল ক্লার্ক বাহাদুরের কাছ থেকে সম্রাজ্ঞীর কাছে পাঠানো আমার প্রার্থনার উত্তর এল। এ চিঠির উত্তর আমার অপবাদ আর প্রত্যাশাকে আরও বাড়িয়ে দিল।

আমি জানি, যদি ভারতের সিপাহি বিদ্রোহে এখানকার প্রশাসন ধ্বংস না হতো, আর বর্বর ও অকৃতজ্ঞ সিপাহিদের হাতে আদালত বিরান না হতো, তাহলে ইংল্যান্ডের ফুলের বাগান থেকে আমার মনের বাসনা পূরণ করা হতো এবং আমার দুই চোখ আর আমার মন দুটোই একে অন্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করত।

এখন এসব পবিত্র চিঠি, যেগুলোতে রয়েছে আমার আবেগময় বাসনার তালিকা, আমার বিচারবুদ্ধি আর জ্ঞানের রক্ষাকবচস্বরূপ সেসব চিঠি আমার কাছেই আছে। এগুলো কলজের কয়েকটি টুকরো, যা আমার দুই চোখ বেয়ে আবেগের অশ্রু হয়ে ঝরে পড়েছিল। কলজের আঁচড়ে বের হওয়া রক্তের সেই দাগ আমার আস্তিনে লেগে আছে।

আমি তীর বা তরবারির আঘাতে আহত হইনি। আমাকে কোনো বাঘ আহত করেনি। আমি বেদনায় আপ্লুত হয়ে ঠোঁট কামড়েছি আর জিবকে রক্তাক্ত করেছি। কলজের রক্ত পান করছি, আর জীবন সম্পর্কে হতাশ হচ্ছি।

মির্জা ইউসুফের বাড়িতে লুটতরাজ

২১ সেপ্টেম্বর বুধবার দিল্লি শহর ইংরেজরা দখল করে নেয়। গলির দরওয়াজা বন্ধ করা হয়েছে সতেরো দিন হলো। সংবাদ পেলাম, আমার ভাইয়ের বাড়িতে লুটেরারা চড়াও হয়েছে। গলির অন্যান্য বাড়িতেও লুটতরাজ হয়েছে। গোরারা পাগল মির্জা ইউসুফ খান, বাড়ির প্রহরী ও চাকরানি বুড়োবুড়িকে প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিয়েছে। এই গোলযোগের সময় দুজন হিন্দু এসে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। বৃদ্ধ দারোয়ান এবং বৃদ্ধা চাকরানি আশ্রয় নেওয়া হিন্দুদের সাহায্যে আহার সংগ্রহে চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

এখানে উল্লেখ্য, এই ধরপাকড় আর ধ্বংসলীলার মধ্যে প্রত্যেক গলি আর বাজারে বিপদ একই ধরনের ছিল না। কোথাও সিপাহিরা দয়া

করে, আবার অন্য কোথাও কড়াকড়ি করে সিপাহিদের কেউ দয়া বা করুণা করলেও অন্যজন কঠোর ব্যবহার করত। এটা ছিল একেবারেই ব্যক্তিগত পর্যায়ের ব্যাপারস্যাপার।

ইংরেজ সৈন্যদের জনপ্রিয়তা এবং শান্তির অঙ্গীকার

আমি জানি, এই ব্রিটিশ সেনা অভিযান পরিচালনাকারীদের প্রতি এ রকমের নির্দেশ ছিল, যে লোক আনুগত্য প্রকাশ করবে, তাকে হত্যা করা হবে না, কেবল তার মালামাল কেড়ে নেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সৈন্যদের মোকাবিলা করবে, তাদের মালামালের পাশাপাশি তাদের জীবনও ছিনিয়ে নেওয়া হবে। নিহত লোকজনের ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে তারা নিশ্চয় সৈন্যদের আদেশ অমান্য করেছিল, আর সে কারণেই তাদের হত্যা করা হয়েছে। কথিত আছে, সাধারণত মালামাল লুট করা হয় কিন্তু কাউকে হত্যা করা হয়নি। এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত নগণ্য। কেবল দু-তিনটি গলিতে প্রথমে গোরা সৈন্যরা লোকজনকে হত্যা করে। পরে মালামাল লুট করা হয়। অবশ্য প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, বয়স্ক লোকজন, মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা হবে না।

এই জায়গায় এসেই আমার লেখনী থেমে যায়। এবার আমি বুলন্দ আওয়াজ তুলব, যেন লেখার কলম এগিয়ে যায়। হে সত্যের পূজারি, সুবিচারের প্রশংসাকারী আর অত্যাচারকে অশুভ আখ্যা দানকারী যদি অত্যাচার-নির্যাতনকে নিন্দা আর সুবিচারের প্রশংসায় আপনাদের মন ও মুখ এক হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর দোহাই, ভারতীয়দের নিয়মতান্ত্রিকতার কথা স্মরণ করুন। এ ছাড়া এর আগে শত্রুতার কোনো ভিত্তি, ঝগড়ার কোনো কারণ থাকলে থাকতেও পারে, তা বলে এই ভারতীয়রা নিজের প্রভুদের বিরুদ্ধে তরবারি হাতে তুলে নিল! অসহায় মহিলা আর দোলনায় ক্রীড়ারত শিশুদের হত্যা করল! অথচ আমরা সবাই জানি, প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা পাপ।

এর পরিবর্তে ইংরেজরা শত্রুতার বদলা নিতে প্রস্তুত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতে সৈন্যদের সুসজ্জিত করে। শহরবাসীর ধারণা ছিল, এই মহাপরাক্রমশালী ইংরেজরা শহর দখল করার পর কুকুর-বিড়ালকে পর্যন্ত জীবন্ত ছাড়বে না। কিন্তু তারা নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। বুকে তাদের ক্রোধের আগুন জ্বললেও মহিলা ও শিশুদের ওপর তারা কোনো ধরনের নির্যাতন করেনি। তারা সাধারণ মানুষের জানমাল সুরক্ষার দায়িত্ব নেয়নি। কারণ দোষী ও নির্দোষদের মধ্যে যেন পার্থক্য করা যায়। যাদের কৈফিয়ত তলব ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে, তাদের ছাড়া আর কারোরই হাজিরা দেওয়ার অনুমতি ছিল না।

শহরের বেশির ভাগ মানুষকেই বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। কিছু লোক আশা ও বিপদের আশঙ্কা নিয়ে শহরেই থেকে গেছে। শহরের বাইরে যারা নির্জন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল অথবা শহরের বাইরে চলে গিয়েছিল, তাদের ব্যাপারে কোনো ধরনের নির্দেশ জারি হয়নি। তাদের বেদনার কোনো চিকিৎসা নেই। অবশ্য শহরের ভেতর ও বাইরে অবস্থানকারীরা পরস্পরের জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারত, যদি তাদের দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগ না থাকত। মোদ্দা কথা, শহরের ভেতরের সবাই যেমন অসহায় ছিল, তেমনি বাইরের লোকজনও ছিল বিপন্ন। প্রত্যেকের হৃদয় বেদনাপ্লুত আর গণহত্যার ভয়েও ভীত।

কর্নেল ব্রাউনের সামনে হাজিরা দান

৫ অক্টোবর সোমবার বিপদ এসে হাজির। দুপুরে হঠাৎ কয়েকজন গোরা সৈন্য গলির প্রধান ফটক বন্ধ দেখে দেয়ালে উঠে পড়ে। তারপর ছাদে উঠে সেখান থেকে লাফিয়ে গলিতে নেমে আসে। তাদের রাজা নরেন্দ্র সিংয়ের সিপাহিদের বাধা দেওয়াটা ঠিক হয়নি। তবে বাধা দিয়ে

তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। অন্য ছোট ছোট বাড়িঘর পেরিয়ে ইংরেজ সৈন্যরা আমার বাড়িতে এসে ঢোকে। তারা ভালো মানুষের মতো আমার বাড়ির মালামালে হাত দেয়নি। গোরা সৈন্যরা আমার দুই ছেলে, জন তিনেক কর্মচারী এবং কয়েকজন ভদ্র প্রতিবেশীসহ আমাকে গলি থেকে দুই ফার্লং দূরে জ্ঞানী ও সত্যবাদী কর্নেল ব্রাউনের কাছে নিয়ে হাজির করা হয়। তখন তিনি চকের পাশে কুতুবুদ্দীন সওদাগরের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। কর্নেল ব্রাউন আমার সঙ্গে অত্যন্ত বিনয়ী ও মানবিক ব্যবহার করেন। আমার নাম ও অন্যদের পেশা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারপর আমাদের সসম্মানে তক্ষুনি ফিরে আসার অনুমতি দেন। আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি। খোশ মেজাজ ও ভদ্র আচরণের এই কর্নেল ব্রাউনের প্রশংসা করার পর বাড়িতে চলে আসি।

৭ অক্টোবর

৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় তোপের আওয়াজে কানে তালা লাগার অবস্থা হয়। এই সতর্কধ্বনি আমাকে হতবাক করে দেয়। আমি ভাবতে থাকি, লে. গভর্নর বাহাদুর এলে ১৭ বার তোপধ্বনি করা হয় এবং নবাব গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের বেলায় করা হয় ১৯ বার। কিন্তু এবার ২১ বার তোপধ্বনি করার কারণ কী? পরদিনও এ ব্যাপারে তেমন কিছু সংবাদ জানতে পারিনি। আমার ধারণা, দেশের বিশৃঙ্খলা রোধে ইংরেজরা হয়তো কোথাও বিদ্রোহীদের পরাজিত করে বিজয় লাভ করেছে।

উল্লেখ্য, তখনো বেরিলি, ফররুখাবাদ ও লক্ষ্ণৌর মতো অনেক জায়গায় বিদ্রোহীরা গোলযোগ চালিয়ে যাচ্ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে তারা অযথাই সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। খোদা চাইলে বিদ্রোহীদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হোক এবং তাদের সেই হাত নিস্তেজ হয়ে পড়ুক, যার সাহায্যে তারা লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে।

মেয়োতিদের গোলযোগ

এদিকে সোনহা ও নোহ এলাকায় মেয়োতি গোত্রের লোকজন গোলযোগ শুরু করে দেয়, পাগলকে শৃঙ্খলমুক্ত করলে সাধারণত যা ঘটে থাকে, এখানেও তেমনটাই হয়। তোলারাম নামের একজন বিশৃঙ্খলাপ্রিয় পিশাচের নেতৃত্বে মেয়োতি গোত্রের লোকজন ঐক্যবদ্ধ হয়। তারপর তারা পাহাড়ি এলাকা ও ময়দানে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মনে হয়, ভারতের মাটিতে আবার চারদিকে প্রচণ্ড সাইক্লোন ও আগুনের শিখার মতো গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে।

এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির শুরু কোথা থেকে, আমার তা জানা নেই—এর শেষই বা কোথায়, তা-ও আমার জানা নেই। কান্না ছাড়া যদি আর কিছু দেখে থাকি, তাহলে চোখের জানালা মাটিতে ছেয়ে যাবে। প্রতিদিন কালো অন্ধকার (দুর্ভাগ্য) ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

এ ব্যাপারে দৃষ্টির গোচরে কিছু এসেছে, তেমনটা বলা দুষ্কর। তবুও বলতে পারি, কালো দিবস (দুর্ভাগ্য) এমন কিছু, অন্ধকারে যার কিছুই দেখা যায় না।

গৃহবন্দী

যেদিন আমাকে গোরা সৈন্যরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেদিনটি ছাড়া আমি আর বাড়ির চৌকাঠের বাইরে পা রাখিনি, ঘরের বাইরেও গলি অথবা বাজারে যাওয়া-আসা করিনি। দূর থেকে চক এলাকা দেখার সুযোগ কপালে জোটেনি। আসলে টেকো বুদ্ধিজীবী (নিজামি টেকো) আমার ভাষাতেই বলেছেন, 'আমি জানি না, বাইরের দুনিয়ায় কী ঘটছে! ভালো-মন্দ কী ঘটনা ঘটছে, জানিই না। এই দুরারোগ্য বেদনা আর

হতাশার ক্ষতের উপশমের (হলেও হতে পারত) কথা মনে রেখে ভাবছি, আমি মরে গেছি। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবারও কবর থেকে ওঠানো হয়েছে। আমার খারাপ কাজের সাজা হিসেবে দোজখের কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাধ্য হয়ে এই কয়েদখানায় অসহায়ত্ব আর দুঃখ-বেদনাকে সঙ্গী করেই বেঁচে থাকতে হবে।'

আমার ওপর যা কিছু ঘটেছে, আগামীকালও যদি একই ধরনের কিছু ঘটে; হায়, তখন কী হবে?

রোজনামচা লেখার কৈফিয়ত

আমার ওপর যা কিছু ঘটেছে, এই পুস্তকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেসব ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা যেসব ঘটনা আমি শুনেছি, আছে তার বর্ণনাও। আমি শোনা যেসব কথা লিখেছি, কেউ যেন মনে না করেন যে আমি মিথ্যা কথা শুনেছি অথবা গা-ছাড়াভাবে যে পরিস্থিতির বর্ণনা করেছি অর্থাৎ যা কিছু ঘটেছে, আমি তার বিবরণ দিয়েছি কম করে। আমি জাদুটোনায় বিশ্বাসী নই, আল্লাহর কাছ থেকে পরিত্রাণের পথ চাই এবং সত্যের কাছে মুক্তি অনুসন্ধান করি। দুই চোখের দৃষ্টি দুর্বল হয়ে পড়েছে, হৃদয় বেদনায় বন্দী আর ঠোঁট জোড়া নিস্পন্দ। মানুষের ঠোঁটের নড়াচড়া থেকে আমি বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করি। আমার এই দুরবস্থা কত যে অসহনীয়, আপনারা সহজেই সেটা অনুমান করতে পারবেন।

আমি সম্রাট আর সম্রাট তনয়দের পরিণতি সম্পর্কে কিছুই লিখিনি, অথচ এসব ঘটনা দিল্লি শহর বিজয়ের কথায় প্রথমেই লেখা উচিত ছিল। না লেখার কারণ একটাই। আমার সবকিছু ছিল কানে শোনা ঘটনা। আর ছিল শুনতে পাইনি এমন সব ঘটনাও। অবশ্য আমি যখন বর্তমান সংকটময় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসব, তখন যেসব ঘটনা সম্পর্কে কিছু শুনতে বা জানতে পারিনি, এদিক-সেদিক থেকে তা সংগ্রহ

করব তখন বিজ্ঞজনের মতো গোপন সব কথা লিখব। আমি আশা করি, আমার এই দিনলিপি যাঁরা পড়বেন, কাহিনির শুরু আর শেষ নিয়ে এবং ভূমিকা ও লেখনীর ঢিলেঢালা ভাবের জন্য আমার প্রতি সুবিচার করতে কসুর করবেন না।

১৯ অক্টোবর

১৯ অক্টোবর রোববার, তারিখটি সাপ্তাহিক ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে ছেঁটে ফেলা উচিত। আগুনমুখা সাপ সেদিন পৃথিবীকে গিলে ফেলেছিল। সেদিনই সকালে হতভাগা দারোয়ান আমার ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে হাজির। সে জানাল, টানা পাঁচ দিন মির্জা ইউসুফের দারুণ জ্বর ছিল। শনিবার মাঝরাতে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চিরকালের জন্য সে চলে গেছে। পানি, রুমাল, কাফনের কাপড়, গোসল করানোর লোক, গোরখোদক, ইট, চুন ও ইটের গাঁথুনি দেওয়ার মালমসলার কথা বাদই দিলাম। এখন বলুন, আমি কীভাবে সেখানে যাব, আর লাশই বা কোথায় নিয়ে যাব? কোন কবরস্থানে দাফন করব? বাজারে ভালো-মন্দ কোনো কাপড়ই পাওয়া যায় না। মাটি খোঁড়ার মজদুর কোথায় পাব? শহরে কবর খোঁড়ার কোনো মজদুরই নেই। হিন্দুরা নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে তাদের লাশ পুড়িয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের দু-তিনজন লোকের একসঙ্গে রাস্তায় চলার উপায় নেই। কফিন বহন করার লোক কোথায়, যারা শহরের বাইরে লাশ বহন করে নিয়ে যাবে!

মির্জা ইউসুফের দাফন

প্রতিবেশীরা আমার নিঃসঙ্গতায় দয়া করে আমার ভাইয়ের দাফনকাফন করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। পাতিয়ালার মহারাজের একজন

সিপাহিকে সামনে রেখে আমার দুই চাকর ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে আমি রওয়ানা হই। লাশের গোসলের ব্যবস্থা মসজিদে করা হয়। বাড়ি থেকে দুই-তিনটি চাদর নিয়ে যাই। ইউসুফের বাড়ির লাগোয়া মসজিদের সামনে মাটি খুঁড়ে কবর তৈরি করা হয়। আর চাদরে মুড়ে লাশ কবরে রেখে তাতে মাটি চাপা দিয়ে সবাই চলে আসি।

হায় ভাগ্য, আমার ভাই ষাট বছর বেঁচেছিল। ত্রিশ বছর সুস্থ জীবন যাপন করেছে আর ত্রিশ বছর কেটেছে তার অসুস্থতায়। কবরের মাটির বালিশ ছাড়া তার ভাগ্যে কিছুই জুটল না। হে খোদা, এই মৃত ব্যক্তির প্রতি দয়া করো, জীবনে আরাম কী বস্তু, তার স্বাদ পায়নি। তার মনে শান্তি দেওয়ার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠাও, আর তার রুহ বেহেশতে প্রবেশ করাও। এই ভালো মানুষটি হতভাগা, জীবনের ত্রিশ বছর আনন্দে আর ত্রিশ বছর অসুস্থতার (পাগল) মধ্যে কাটিয়েছে। সুস্থ অবস্থায় রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না এবং পাগল অবস্থায় কাউকে কষ্ট না দেওয়াই ছিল তার অভ্যাস। হিজরি ১২৭৪ সালের ২৯ সফরের রাতে সে মারা যায়।

এক ব্যক্তি আমার কাছে বেচারি মির্জা ইউসুফের মৃত্যুর তারিখ জানতে চায়। সে এই পৃথিবীতে পরিচয়হীন জীবন যাপন করেছে। আমি 'আহ্' উচ্চারণ করে এই বলে জবাব দিলাম, 'দরিগ দিওয়ানা।'

মির্জা ইউসুফের মৃত্যুর তারিখ

'দরিগ দিওয়ানা' (এই ফারসি শব্দ থেকে সন গণনার সংখ্যা বের করা হয়) অনুযায়ী জন্ম তারিখ গণনা করলে ১২৯০ হিজরি পাওয়া যায়। এ সংখ্যা থেকে 'আহ্' শব্দের ১৬ বাদ দিলে বেরিয়ে আসে ১২৭৪ হিজরি, যা প্রয়োজনীয় ছিল। মোদ্দা কথা, 'আল্লাহর নামে তার দরবারে যেখানেই ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন, তুমি সেখানেই মাথা নত করবে, সেটাই হবে তার আস্তানা।'

লোহারুর শাসকের বিনাশ

যে সপ্তাহে ইংরেজরা দিল্লি শহর দখল করে, সে সময় খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী আমিনউদ্দিন খান বাহাদুর এবং মুহম্মদ জিয়াউদ্দিন খান বাহাদুর নিরাপত্তার খাতিরে শহর ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি ছাড়া তিনটি হাতি এবং চল্লিশটি ঘোড়া তাঁদের সঙ্গে ছিল। তাঁরা লোহারু পরগনার দিকে যাত্রা করে, সেটা ছিল তাদের পৈতৃক জায়গির। প্রথমে তাঁরা মেহেরওলি গেলেন এবং সেখানে একটি করবস্থানে দু-তিন দিন অবস্থান করে বিশ্রাম নেন। সে সময় লুটেরা সিপাহিরা তাদের ঘেরাও করে, পরনের কাপড় ছাড়া তাদের কাছে থাকা সব মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। অবশ্য বিশ্বস্ত মাহুত তিনটি হাতি নিয়ে ওই লুটতরাজের আগেই সেখান থেকে সটকে পড়েছিল। ধ্বংসের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া তিনটি হাতি যেন পুড়ে যাওয়া শস্যাগার।

লুটপাটের কবলে পড়ে তাঁরা অসহায় ও কপর্দকহীন অবস্থায় (যা আপনারা সহজে অনুমান করতে পারেন) দোজানা রাজ্যের দিকে যাত্রা করেন। দোজানার খ্যাতিমান ভদ্র চরিত্রের শাসক হাসান আলী খান বাহাদুর মানবতা ও উদারতা দেখিয়ে তাদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আমার বাড়ি আপনাদেরই বাড়ি।' এ কথা বলে তিনি তাঁদের দোজানায় নিয়ে যান।

কাহিনি এবার সংক্ষিপ্ত করা যাক। ভদ্র স্বভাবের শাসক হাসান আলী খান তাঁদের সঙ্গে এমন সদ্ব্যবহার করলেন, যেমনটা করেছিলেন ইরানের শাহ বাদশাহ হুমায়ুনের সঙ্গে। ইংরেজ কমিশনার সংবাদ পেয়ে তাঁদের ডেকে পাঠান। তাঁরা শহরে এসে কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কমিশনার প্রথমে কিছুটা কড়া মেজাজে কথাবার্তা বললেও তাঁদের ভদ্র ও নরম জবাব শুনে আর তেমন কোনো কথা বলেননি। লাল কেল্লার ভেতরে খানসামাদের গৃহের পাশে তাঁদের থাকার নির্দেশ দেন।

বর্ণনায় মনোযোগের অভাবে এই পরিবারের ধ্বংসের কাহিনি পুরোপুরি লিখতে পারলাম না। তবে বুঝতে হবে যে তাঁদের মালামাল মেহেরওলিতে যেভাবে লুট করা হয়েছে, দিল্লিতে মালিকবিহীন খালি

বাড়িতেও একইভাবে লুটতরাজ চালানো হয়। যে আসবাবপত্র তাঁরা সঙ্গে করে মেহেরওলিতে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলোও লুটেরারা লুট করে নিয়ে যায়। জীবন হাতে নিয়ে কোনোমতে তাঁরা দোজানা রাজ্যে গিয়ে পৌছান বাড়ির মালমাল লুট হওয়ার ফলে বাড়ির ইট-পাথরগুলোই কেবল অবশিষ্ট ছিল। ব্যক্তিগত কোনো অলংকার রক্ষা করা যায়নি। পোশাক ও বিছানার চাদর পর্যন্ত লুটেরার দল লুট করে নিয়ে গেছে। এক টুকরো সুতো পর্যন্ত তারা রেখে যায়নি। খোদা এসব নিরপরাধ লোকদের ওপর দয়া বর্ষণ করুন। তাদের প্রতিকূল অবস্থার পরিণতি যেন শুভ হয়, বিপদের পর তাদের ভাগ্যে যেন সুখ জোটে।

জাহ্জর ও ফররুখ নগরের শাসক গ্রেপ্তার

সম্ভবত ১৭ অক্টোবর শনিবার দুজন বিজ্ঞ ব্যক্তি শহরে এলেন এবং আগেই বলেছি, তাঁরা দিল্লির কেল্লায় অবস্থান করছিলেন। এর দু-তিন দিন পর গোরা সৈন্যরা গিয়ে জাহজরের শাসনকর্তা আবদুর রহমানকে আসামির মতো ধরে আনে। তারপর তাঁকে কেল্লার দেওয়ানে আমে একটি কক্ষে এনে রাখা হয়। ইংরেজরা তার সব জায়গির বাজেয়াপ্ত করে।

২১ অক্টোবর শুক্রবার ফররুখ নগরের শাসনকর্তা আহামদ আলী খানকে একইভাবে গ্রেপ্তার করে আনা হয়। আবদুর রহমান খানের মতো তাঁকেও লাল কেল্লায় আলাদা একটা জায়গায় থাকতে দেওয়া হয়। ফররুখ নগরও লুটেরাদের কবলে পড়ে। শহরবাসীর আসবাবপত্র ও মালামাল লুট করে নিয়ে যায় তারা।

বাহাদুরগড় এবং বল্লভগড়ের শাসনকর্তা গ্রেপ্তার

২ নভেম্বর সোমবার দাদরি এবং বাহাদুরগড়ের শাসনকর্তা বাহাদুর জং খানকে গ্রেপ্তার করে এনে কেল্লায় রাখা হয়। ৭ নভেম্বর শনিবার

বল্লভগড়ের শাসনকর্তা রাজা নাহের সিংকে গ্রেপ্তার করে আনার ফলে কেল্লার বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানরত শাসকের সংখ্যা আরও একজন বেড়ে যায়।

উল্লেখ্য, দিল্লির এজেন্সির অধীনে যে কয়টি জায়গির ছিল, তার সংখ্যা সাতটির কম নয়। এগুলো হলো জাহ্জর, বাহাদুরগড়, বল্লভগড়, লোহারু, ফররুখ নগর, দোজানা ও পতৌদি। আগেই বলেছি, এঁদের মধ্যে পাঁচজন শাসনকর্তা কেল্লায় অবস্থান করছিলেন। বাকি ছিলেন পতৌদি ও দোজানার দুই জায়গিরদার। তাঁরা সরকারি বাজেয়াপ্তির ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। তাঁদের শেষ পরিণতি কী হয়, তা দেখার অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা।

এ কথা গোপন ছিল না যে মোজাফফর দৌলা সাইফউদ্দিন হায়দার খান ও জুলফিকার উদ্দিন হায়দার খান—এই দুজনের উপাধি ছিল হোসাইন মির্জা। গোলযোগের এই সময়টায় তাঁরা দুজন অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তির মতোই স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে শহরের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। চলে গিয়েছিলেন মূল্যবান আসবাবপত্র ভরা বাড়িঘর ফেলে। বাধ্য হয়েছিলেন মরুভূমিতে যাযাবরের মতো জীবন যাপনে।

তাঁদের প্রত্যেকেরই বেশকিছু প্রাসাদভবন ছিল। ছিল এসব ভবনসংলগ্ন কয়েকটি বেশ দীর্ঘ ও প্রশস্ত জায়গাজুড়ে বাড়ি। একটা বড় শহর না হোক, অন্তত একটা গ্রামের সমান জায়গাজুড়ে গড়ে উঠেছে এসব প্রাসাদ। পরিমাপ করলে এই হিসাবই মিলবে।

এসব বৃহৎ প্রাসাদ ও মহলে কোনো লোকজন ছিল না। লুটতরাজের ফলে খাঁ খাঁ শূন্য হয়ে পড়েছিল।

কেবল কমদামি অথচ ভারী কিছু জিনিসপত্র। যেমন—প্রাসাদের পর্দা, শামিয়ানা, খড়ের ছাদ, শতরঞ্জি এবং ফরাস জাতীয় জিনিসপত্র পড়ে ছিল। হঠাৎ এক রাতে এসব আসবাবপত্রে আগুন ধরে যায়। আগের দিন সকালে রাজা নাহের সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আগুনের স্ফুলিঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাঠ, পাথর ও দরজা-জানালা

পুড়ে ছাই হয়ে যায় এসব ইমারত আমার বাড়ির পশ্চিম দিকে ছিল। ছিল তার খুবই কাছাকাছি। গভীর রাতে জ্বলন্ত আগুনের শিখা ছাদ থেকে দেখেছি। সেই আগুনের ধোঁয়ার উত্তাপ আমার চোখেমুখে এসে লাগছিল। বাড়ির পেছন দিককার প্রাচীরের জ্বলন্ত আগুন থেকে ছাই উড়ে এসে আমার গায়ে পড়ছিল অবশ্য প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে ভেসে আসা উচ্চসুরের সংগীত উপহারের মর্যাদামণ্ডিত হলে প্রতিবেশীর বাড়ির আগুন ছাই কেন ছড়াবে না!

যুবরাজ সমাচার

আমার কলম কাঁপছে (ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়) আধমরা পিঁপড়ের চলার গতির মতো, কাগজের পাতায় চোখে দেখা যায়—এমন ঘটনার রূপ কীভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়! যুবরাজদের সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। কয়েকজন যুবরাজকে গুলি করে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর অজগর এভাবে তাঁদের গিলে খেয়েছে। তাঁদের কয়েকজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। জল্লাদের রশি টানাটানিতে তাঁদের প্রাণপাখি নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আবার কয়েকজন নির্জীব বেদনাসিক্ত যুবরাজ কয়েকখানায় বন্দী, আবার অনেকে হতবুদ্ধি ও কপর্দকহীন অবস্থায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুর্বল ও বৃদ্ধ সম্রাটের বিরুদ্ধে চলছিল মামলা।

জায়গিরদার হত্যা

যথাক্রমে জাহজর ও বল্লভনগরের দুই জায়গিরদারকে পৃথক পৃথক তারিখে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁদের এমনভাবে হত্যা করা হয়, কেউ অভিযোগ করতে পারবে না যে রক্ত ঝরানোর মতো কোনো কাণ্ড ঘটানো হয়েছে।

জানুয়ারি ১৮৫৮

১৮৫৮ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে হিন্দুদের মুক্তির আদেশ জারি এবং শহরে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। হিন্দুরা যে যেখানেই ছিল, শহরের দিকে যাত্রা করে। মুসলমানদের বিরান বাড়িঘরে (খালি থাকার ফলে) সবুজ ঘাস জন্মেছে, দরজা-জানালা পর্যন্ত সবুজে সবুজে ছেয়ে গেছে। প্রতিটি মুহূর্তে দরজা-জানালায় জন্মানো সবুজ ঘাসের মুখ দিয়ে যেন আওয়াজ হচ্ছে, মুসলমানদের জায়গা যথারীতি খালি আছে।

হাকিম মাহমুদ খানের পরিবারের লোকজন গ্রেপ্তার

সম্ভবত অসৎ গুপ্তচরদের কানকথায় দিল্লি শহরের প্রশাসক ভেবেছেন যে রাজা নরেন্দ্র সিং বাহাদুরের চিকিৎসকদের বাড়িতে মুসলমানরা সমবেত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে। হতবাক হওয়ার মতো দশা, অসভ্য এসব গুপ্তচর এমনভাবে গল্প সাজিয়েছে, যেন তাদের সম্প্রদায়ের দু-একজন মুসলমানদের ওই সমাবেশে উপস্থিত ছিল। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার শহরের প্রশাসক কয়েকজন সিপাহিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাজির হন এবং বাড়ির মালিকসহ ষাটজন আশ্রয় গ্রহণকারী ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান। অবশ্য দিন কয়েক জেলে রাখা হলেও সম্মানিত ব্যক্তিদের মতো তাদের যত্নআত্তি করা হয়।

৫ ফেব্রুয়ারি

৫ ফেব্রুয়ারি জুমার দিন হাকিম মাহমুদ খান, হাকিম মুর্তজা খান এবং তাঁর ভাতিজা আবদুল হাকিম খান ওরফে হাকিম কালেকে বাড়ি ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি জুমার দিন কয়েকজন এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার আরও অন্য তিনেক লোক বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু

অর্ধেকের বেশি লোক তখনো জেলখানায় ছিল প্রতিবেশীদের এই বিপদে এবং গলিতে সংঘটিত গোলযোগের কারণে আমার মতো দরবেশের বেদনাতুর হৃদয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। তা সত্ত্বেও এই ঘটনায় আমাকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। আমি এ অবস্থায় সারা দিন চিন্তিত থাকি, আর রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পর্যন্ত পারি না।

স্যার জন লরেন্সের প্রশংসায় কাসিদা

ফেব্রুয়ারি মাস সেকালে ছিল সমারোহের মাস। কারণ ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল বসন্তকালের প্রথম মাস সে সময় সূর্যের আলোর মাত্রা ও তাপ বেড়ে যায়। সূর্যকে বৃহস্পতি পর্যন্ত পৌছতে এক মাস সময় পাড়ি দিতে হবে। দয়ালু শাসক, চোখের মণি চিফ কমিশনার স্যার জন লরেন্স সাহেবের আগমনের সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের শাসক, বিশেষত এই শহরের (দিল্লি) প্রশাসকের আগমন ঘটলে আমি তাঁর প্রশংসায় কাসিদা লিখতাম। এটাই ছিল আমার অভ্যাস। তাই আমি স্যার জন লরেন্সের প্রশংসায় একটি কাসিদা (স্তুতিমূলক কবিতা) লিখি। তাঁদের বিজয়, তাঁর আগমনকে স্বাগত জানিয়ে এই কাসিদা লিখি। ১৯ ফেব্রুয়ারি জুমার দিন আমি এই কাসিদা ডাকযোগে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিই।

২০ ফেব্রুয়ারি লক্ষ্ণৌ বিজয়ের সুসংবাদ

২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মেঘের গর্জনের মতো আওয়াজ আর ভয়ংকর শব্দে ২১ বার তোপধ্বনি হলো। রোববার সকালে লক্ষ্ণৌ শহর জয়ের সংবাদ বিস্তারিতভাবে জানা গেল। ১৬ ফেব্রুয়ারি ইংরেজ সেনাপতি বাহাদুর যুদ্ধবাজ পোড়ামুখ বিদ্রোহীদের ওপর প্রচণ্ড হামলা চালায়। আকাশের সেনাপতি (মঙ্গল গ্রহ) সুস্থ হাত ও বাহু দিয়ে অনেক আশীর্বাদ

বর্ষণ করল এবং এত প্রশংসা করল যে ঠোঁটে ফোসকা পড়ে যায় আর জিব ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার সুযোগ বিশ্ববাসীকে স্বাধীনতার সুসংবাদ দিল। স্বাধীন ও ভদ্র স্বভাবের লোকের (ইংরেজ) আশা পূরণ হয়েছে এবং খারাপ ও দুশ্চরিত্রের লোকদের শাসনের সেখানেই শেষ হয়েছে। এরপর শোনা গেল তোপধ্বনির গর্জন। আনন্দ-প্রকাশক গানবাজনা। বিজয়ী বীর সৈন্যরা শুধু যুদ্ধে শহর দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং শত্রুদের হত্যা করার জন্য ছুটে যায়। শত্রুদের হতাহত করার পর তারা তাদের নিজেদের ছাউনিতে ফিরে আসে

২৪ ফেব্রুয়ারি চিফ কমিশনারের আগমন

২৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার দুপুরের শুভক্ষণে সুবিচারক, আসমান সমান উঁচু সম্মানের অধিকারী, চাঁদের আলোর মতো দ্যুতিমান, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং চোখের মণি চিফ কমিশনার মহোদয় দিল্লির বুকে পা রাখলেন। মনে হচ্ছে, আকাশে নক্ষত্রের মেলা বসেছে। তেরোবার তোপধ্বনির মাধ্যমে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হলো। এই ধ্বনি রিক্ত হৃদয়ের বেদনার উপশম ঘটাল আর তাঁর প্রতি ভালোবাসায় সিক্ত হওয়ার সুসংবাদ দিল।

সম্রাটের প্রতিনিধি শহরে আসতেই মৃতদেহে যেন প্রাণের সঞ্চার হলো। শহরে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। মনে হতে লাগল যেন সম্রাট শাহজাহান এসেছেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি

২৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার দিনের শেষে রাত এল। রাতের তিন প্রহর কেটে গেছে। তখন মজলুমদের অন্তরের ধোঁয়ায় চাঁদ এমনভাবে ছেয়ে গেছে

যে দর্শকেরা চিৎকার করে বলে ওঠে, চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে। এই শনিবার শহর-ত্যাগীদের প্রবাসজীবনের অবসান হলো। বিচারপ্রার্থী, হতাশ ও দুঃখী লোকজনের শহরে হাজির হওয়ার অনুমতি মিলল এবং আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হলো

অসংখ্য লোকের ফাঁসি

জেলখানা ছিল শহরের বাইরে এবং শহরের ভেতরে ছিল হাজতখানা। হাজত ও জেলখানা অসংখ্য মানুষে ভরে ফেলা হলো। সংকীর্ণ জায়গায় এদের বিপুল সংখ্যা দেখে মনে হয়, মানুষের পেটে যেন মানুষকে ভরে দেওয়া হয়েছে। এ দুটি কয়েদখানায় বিভিন্ন দিনে কত লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, তার সংখ্যা একমাত্র আজরাইলই জানে। শহরে খুঁজলে এক হাজারের বেশি মুসলমানকে পাওয়া যাবে না। আমিও তাদের একজন। যারা শহরের বাইরে চলে গেছে, তারা এত দূরে চলে গেছে যে মনে হয়, তারা কোনো দিনই দিল্লির বাসিন্দা ছিল না। অনেক সম্মানিত লোক শহর ছেড়ে দিল্লির আশপাশে চার থেকে আট মাইল দূরের টিলার গর্তে, ছাপড়ায় এবং কাঁচা বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে অদৃষ্টের ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে পড়েছিল। এসব হতভাগ্য বাস্তুভিটা-ত্যাগী লোকজনের মধ্যে অনেকে যেমন শহরে বসবাসের প্রত্যাশী ছিল, তেমনি ছিল গ্রেপ্তার হওয়া লোকজনের আত্মীয়স্বজন অথবা সরকারি পেনশনভোগীরা। এদের আবেদনপত্রে মুক্তিদান, শহরে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ এবং পেনশন আবারও চালু করার কথা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়বস্তু ছিল না। শহর-ত্যাগী এমন দু-তিন হাজার লোকের দরখাস্ত আদালতে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু এসব সুবিচারপ্রার্থী এবং নির্জনে বসবাসকারীদের চিৎকার কি কেউ শুনতে পায়, নাকি দেখা যায়?

৮ মার্চ

আমি আবেদনপত্র ও প্রশংসাসংবলিত চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় ছিলাম। এই আবেদনপত্র আমি ডাকযোগে পাঠিয়েছিলাম। বিবিধ চিন্তা ও হতবুদ্ধিকর অবস্থায় শহরের প্রশাসকের বাসস্থানে যাওয়ার এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো সুযোগ হয়নি। মোদ্দা কথা, সব দিক থেকেই বিপদ আগুয়ান। চারদিকে শুধু কাঁটা আর কাঁটা বিছানো। বাইরে গেলে রাস্তায় নিজেকে চঞ্চল বালক মনে হবে, আর বাড়িতে বসে থাকলে মনে হয় কাপড়ে মুখ ঢেকে পড়ে আছি। কোথাও শান্তি নেই। এখন পর্যন্ত অস্থিরতা ধৈর্যকে পরাস্ত করতে পারেনি। ৮ মার্চ একটি চিঠি ফেরত এসেছে। চিঠির ওপরে লেখা ছিল, সেটা যেন শহরের প্রশাসকের মাধ্যমে পাঠানো হয়। ব্যাপারটাকে সবাই এবং আমিও একটা আশাব্যঞ্জক জবাবিপত্র বলেই মনে করলাম। মনে হলো, আমার আবেদন ভবিষ্যতে মঞ্জুর হবে। যে চিঠিতে সরকারি নির্দেশ ছিল, তার ভাষা যথাযথ সংযোজন ও সংশোধন করে প্রজাবৎসল প্রাজ্ঞ চিফ কমিশনার চার্লস সান্ডার্স সাহেব বরাবর পাঠিয়ে দিলাম, সঙ্গে পেনশন-সংক্রান্ত একটি পৃথক আবেদনপত্রও সংযোজন করেছিলাম (চার্লস সান্ডার্সের নামে)।

১৭ মার্চ

১৭ মার্চ বুধবার শহর প্রশাসকের কাছ থেকে আদেশ এল, পাঠানো চিঠিতে প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই নেই। এটা পাঠানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি ভাবলাম, এ রকম গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রেম-ভালোবাসা দেখানো আর আনন্দফূর্তি করার সুযোগ নেই। আমি হলাম ভুখা মানুষ। আমার প্রয়োজন রুটি। অপেক্ষা করি, দ্বিতীয় প্রত্যাশার ব্যাপারে। দেখা যাক, কী নির্দেশ আসে!

১৮ মার্চ লক্ষ্ণৌ বিজয়

১৮ মার্চ জুমার দিন সন্ধ্যায় মনে শান্তি দানকারী তোপধ্বনি নীল আকাশে গুঞ্জনের সৃষ্টি করে। এর ভেতর দিয়ে লক্ষ্ণৌ বিজয়, ওই শহরে ঈর্ষাপরায়ণ ইংরেজ সৈন্যদের প্রবেশ এবং সব জায়গায় তাদের যদৃচ্ছ ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে জানতে পারি। ওই শহরের কেল্লা, দেয়াল ও প্রবেশদ্বারের (গেট) কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। নিশ্চয়ই বিদ্রোহী সৈন্যরা দেয়ালের ওপাশ থেকে ইংরেজ সৈন্যদের যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। যখন ওই দুর্বল দেয়াল বীর সৈন্যদের ঝটিকা আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল, তখন নিশ্চয় অশ্বারোহী আর পদাতিক সৈন্যদের পদচারণে প্রত্যেকটি সড়ক ধুলোয় ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, সৃষ্টিকর্তা তাঁর দয়ায় যাঁকে সাম্রাজ্য দান করেন, তাঁকে বিজয়ী হওয়ার শক্তি এবং শান-শওকতও দান করে থাকেন। এ কথার ভিত্তিতেই বলা যায়, যে ব্যক্তি বাদশাহের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার মাথায় জুতো মারা উচিত। শাসনকর্তার সঙ্গে যুদ্ধ করা নিজেকে ধ্বংস করারই শামিল। পৃথিবীবাসীর উচিত, সৃষ্টিকর্তা যাঁদের সৌভাগ্য দান করেন, তাঁর সামনে মাথা নত করা আর শাসনকর্তার আদেশ মেনে চলা। কারণ, তাঁদের আদেশ মেনে চলার অর্থ সৃষ্টিকর্তার আদেশ মেনে চলা। আমরা যখন জেনেছি, সৌভাগ্য, রাজত্ব ও শক্তি কার দান, তখন বিদ্রোহ আর অসন্তুষ্টি কেন? এ কথাগুলো সিরাজের শেখ সাদি কী সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, 'ভৃত্য প্রভুর নির্দেশের সামনে মাথা নত না করে কী করবে! পোলো খেলার ব্যাটের কাছে বল আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কী করতে পারে?' ২২ মার্চ আমার উন্মাদ হৃদয়ে এ কথা বারবার উদয় হাচ্ছিল যে ধরার বুকে ফেব্রুয়ারি মাস (বসন্তকাল) এবং নওরোজের দিনও তাহলে আসে! আলোকিত নওরোজ দু-চার দিন ধরে উদ্‌যাপিত হয়। এ বছর সম্ভবত এই শহর মৃতদের আগারে পরিণত হয়েছে। বসন্তের আগমনীবার্তা শুনেও

আনন্দ লাগছে না। কেউ বলছে না, বসন্ত এবার তুর্কিদের 'দ্বাদশ বছর'-এর মধ্যে কোন বছরে পড়েছে! আর রাত ও দিনের সময়ে সমান সমান মুহূর্ত কবে আসবে? যদি জ্যোতিষিদের মৃত্যু হয়ে থাকে, দিনের আলোর সম্রাট সূর্যের ভূমণ্ডলের কক্ষপথে চলার দিনলিপি লেখার (ভবিষ্যদ্বাণীর চিহ্ন) স্থান যদি শূন্য হয়ে থাকে, তখন বুঝতে হবে, কয়েকজন মিথ্যে বলার লোক কমে গেছে এবং আরও বুঝতে হবে যে কিছু মিথ্যে কথা শুনতেই পাইনি। সূর্য তার ভূমণ্ডলের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করা আর যথাস্থানে থাকার বিষয়টি ভোলেনি। না হলে সবুজ চারা পৃথিবীর বুকে জন্মাবে না আর ফুলও ফুটবে না। সৃষ্টির যে নিয়মরীতি, তা সে বদলাতে পারে না। আকাশের স্থায়ী নিয়মানুযায়ী কক্ষপথে পরিভ্রমণের বিপক্ষে যাওয়া অসম্ভব।

আমি বাগানের জন্য নয়, নিজের জন্য অশ্রু বর্ষণ করছি। বসন্তকাল নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই, নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেকেই অভিযুক্ত করছি। পৃথিবী লাল ফুলে রঙিন আর গোলাপ ফুলের সুগন্ধিতে সুবাসিত, কিন্তু আমি ঘরের এক কোণে অসহায় এবং ভিখারির মতো বসে আছি। বসন্তের মৌসুম অথচ আমি দেউলিয়া হওয়ার কারণে কপর্দকহীন। বাড়ির দরজা বন্ধ করে রেখেছি।

হাকিম মাহমুদ খানের পাতিয়ালা যাত্রা

আমি কাঁদতে কাঁদতে ভাবি, সময় বড়ই বেপরোয়া। আমি বিষণ্নতায় আক্রান্ত। তাই সবুজ তৃণভূমি ও ফুল দেখতে পাই না। মস্তিষ্ক ফুলের সুরভির ঘ্রাণ না পেলে বসন্তের কী আসে-যায় আর বাতাসের কাছে কে ক্ষতিপূরণ চাইবে?

এপ্রিল মাসের মধ্যেই দুই-তৃতীয়াংশ এবং পারসি ক্যালেন্ডারের প্রথম মাসের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ শ্বেতপদ্ম ফুটে থাকে। হাকিম মাহমুদ খানের সঙ্গে যাঁরা জেলখানায় ছিলেন, তাঁদের সবাই মুক্তি পান।

প্রত্যেকে নিজের নিজের পথ খুঁজে নেন। সচ্চরিত্র ও বিত্তশালী পরিবারে সযত্নে প্রতিপালিত হাকিম মাহমুদ খান তাঁর আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী, সন্তানসন্ততি ও পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে পাতিয়ালা যাত্রা করেন। শুনেছি, তিনি তখন পর্যন্ত কর্নালে অবস্থান করছিলেন। জানি না, ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি কী চিন্তাভাবনা করছেন!

মুরাদাবাদ বিজয়

মে মাসের শুরুর দিকে বীর ইংরেজ সৈন্যরা মুরাদাবাদ জয় করে ফেলে। এ এলাকা ছিল শয়তান প্রকৃতির বিদ্রোহীদের আবাসস্থল। শহরের সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য সম্ভ্রান্ত বংশের জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী নবাব ইউসুফ আলী খানকে মুরাদাবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যিনি বিশ্ব জয় করার এবং বিশ্বের শাসক হওয়ার যোগ্য, এ এলাকা শাসন করছেন তিনি এবং আমার আশা, তিনি সর্বদা এ এলাকার শাসনকর্তা হয়েই থাকবেন।

বেরিলি বিজয়

পাহাড়ের গুহা ভেদকারী এবং অজগর শিকারি সৈন্যরা যখন বেরিলি ও মুরাদাবাদে প্রচণ্ড হামলা চালায়, তখন বেরিলির পাপী বিদ্রোহীরা শক্তিশালী সমুদ্রের ঢেউ যেমন খড়কুটোকে ভাসিয়ে তীরে নিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে তারা শহরের বাইরে বিতাড়িত হয়। যেসব উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহী এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, শহর-গ্রামের লোকজনকে বিরক্ত এবং পথচারীদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল, তাদের শাসনকাল যে শেষ হয়ে যাবে, আর সারা দেশ ন্যায়বিচারক ইংরেজদের প্রশাসনের পতাকাতলে সমবেত হবে, চলমান পরিস্থিতি দেখে আমার সেটাই মনে হয়েছিল।

১৩ জুন বাহাদুর জং খানের অবস্থা

শহরের গোরা প্রশাসক বাহাদুর জং খানকে ১৩ জুন রোববার সন্ধ্যায় ডেকে পাঠান। তিনি কেল্লায় নজরবন্দি ছিলেন। তিনি বুকে অনেক আশা নিয়ে তাঁদের কাছে যান। তাঁকে প্রাণে মারা হয় না এবং তঁর নামে মাসিক এক হাজার রুপি পেনশন মঞ্জুর করার সুসংবাদ তাঁকে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাঁকে লাহোরের দিকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ এরপর তিনি স্বাধীনভাবে বসবাস করবেন এবং লাহোর শহরেই তাঁকে থাকতে হবে। নিঃসন্দেহে এই পরিস্থিতিতে নিজের মর্যাদা নিয়ে দুশ্চিন্তা ও ধন-সম্পদের জন্য অনুশোচনা করা থেকে তাঁর মুক্ত হওয়া এবং তাঁকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাঁর সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত হওয়া উচিত।

গোয়ালিয়র বিজয়

দিনের রাজা যে সূর্য, যার মস্তক প্রতিদিন বর্শার ফলার মতো চক্কর দিয়ে বেড়ায়, সেই সূর্য তখনো পূর্ব দিকে ওঠেনি। জুন মাসের অতিক্রান্ত দিনগুলোয় সংখ্যা অনুপাতে বজ্রের মতো তোপের গর্জন শোনা গেল (অর্থাৎ ২১ বার তোপধ্বনি হলো)। ফলে বন্ধুদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে আর আগুনের চেয়ে অধিক জ্বলন্ত বেদনার ছাই শত্রুদের মাথায় ও মুখে নিক্ষেপ করা হয়। গোয়ালিয়র শহরের বিজয় এবং তার শক্তিশালী কেল্লা দখল করার সুসংবাদ খোদার দরবার থেকেই যেন বিদ্রোহীদের জন্য মৃত্যুসংবাদ বহন করে আনে। এই আনন্দতরঙ্গে শাসক ও শাসনকর্তাদের প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বলে ওঠে। তাঁদের আশা পূরণের স্বর্গীয় সুসংবাদও তাঁরা পান এই জয়ের ঘটনার ভেতর দিয়ে।

এই কাহিনির বিবরণটা এ রকমের—বিদ্রোহীরা গোয়ালিয়র দখল করে নেয়। এখানকার মহারাজা জিয়াজি রাও প্রশাসন ও শহর

দুটোই ছেড়ে আগ্রায় চলে আসেন। তারপর ইংরেজদের সাহায্য চান। ইংরেজ সৈন্যদের সহায়তায় মহারাজা রাও গোয়ালিয়র পুনরায় দখল করার জন্য যাত্রা করেন বিদ্রোহীদের শোচনীয় পরাজয় হয় এর থেকে বোঝা যায় যে এই পথভ্রষ্টদের পরিণতি এমনই হয়ে থাকে। এসব দুর্ভাগা এদিক-সেদিক লুটপাট করে বেড়াবে, অবশেষে অপমানজনকভাবে তাদের মৃত্যু হবে। ঘাস ও পানির অভাবে তাদের ঘোড়াগুলোকে ময়দানের মাটিতে মৃত পড়ে থাকতে দেখা যাবে। ছাউনিতে বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র ও মালামাল ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকবে। এমন অবস্থা হবে যে তখন ভারতে নির্যাতন ও অত্যাচারের খড়কুটো পর্যন্ত থাকবে না। জঙ্গলে পূর্ণ বাগানের প্রতিটি আনাচকানাচ সবুজে ছেয়ে যাবে এবং প্রতিটি রাজপথ বাজারের মতো আলোকিত দেখা যাবে। এ লেখকের বয়স তেষট্টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। নানা ধরনের মানসিক যন্ত্রণা ও বেদনার কারণে এ কথা সুস্পষ্ট যে সে যুগে আরও অধিক বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার প্রত্যাশা করা বোকামি। বাধ্য হয়ে সিরাজের প্রখ্যাত কবির (শেখ সাদি) কবিতার পুনরাবৃত্তি করছি, ঠিক যেভাবে একজন দুঃখ-ভারাক্রান্ত মানুষ অন্য দুঃখীর কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে থাকে, ঠিক সেইভাবে : যদি এতে মন খুশি করতে না পারি, তাহলে অন্তত দুঃখ-বেদনার বন্দিত্ব থেকে তো মুক্তি পেতে পারি! নিচে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

> 'হায় আফসোস, দুর্ভাগ্য, আমার অবর্তমানে পৃথিবীর বুকে বসন্তের অনেকবার আগমন ঘটবে আর ফুল ফুটবে। পারসি দিনপঞ্জির বেহেশতের চতুর্থ মাস বারবার আসবে কিন্তু তত দিনে আমি কবরের মাটিতে মিশে যাব।'

প্রকৃতপক্ষে সত্য কথাকে চাপা রাখা ভালো মানুষের স্বভাব নয়। আমি আধা মুসলমান। ধর্মীয় বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত এবং দুর্নাম আর অপমানের দুঃখের ভয় থেকে স্বাধীন। সর্বদা রাতে বিলেতি মদ্য পানে

অভ্যস্ত। এই মদ না পেলে রাতে ঘুম আসে না। ইদানীং শহরে বিদেশি মদের দাম চড়া। আমি গরিব ভিখারি। যদি সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুগত, বন্ধুভাবাপন্ন, উদার মন আর দয়ালু মহেশ দাস বিদেশি মদের মতো মানসম্পন্ন এবং তার চেয়ে বেশি সুগন্ধিওয়ালা দেশি মদ না পাঠাত, তাহলে আমার হৃদয়ের আগুন শীতল হতো না। আমি বেঁচেও থাকতে পারতাম না। হৃদয়ের তৃষ্ণা নিয়ে আমি এই জগৎ থেকে বিদায় নিতাম। দীর্ঘদিন যাবৎ আমার মনের বাসনা ছিল, যেভাবে হোক আমার মনের আশা পূর্ণ হোক। মনে আশা ছিল, খাঁটি মদের দু-একটি বোতল যদি পাওয়া যেত, মন্দ হতো না। বুদ্ধিমান মহেশ দাস আমাকে সেই আবেহায়াত (অমৃতরস) দান করেছিল, বীর আলেকজান্ডার পর্যন্ত নিজের জন্য যার খোঁজে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

এ কথা না বললেই নয় যে এই ভালো মানুষটি (মহেশ দাস) শহরের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় তাদের পরিবার-পরিজনকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কোনো চেষ্টারই কসুর করেনি। কিন্তু তার সেই চেষ্টা ও তদ্বির কার্যকর হয়নি। এটা সবারই জানা যে শহরে হিন্দুদের স্বাধীনভাবে থাকার অধিকার দয়ালু ইংরেজ শাসকদের ভালোবাসা ও উদারতারই ফল। যা-ই হোক, দয়ালু মহেশ দাসের এই ব্যবস্থাপনায় নাক গলানোর অধিকার আমার ছিল। কাহিনি সংক্ষিপ্ত করি, তিনি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। মানুষের উপকার করেন। আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করেন। তিনি আমার তেমন পুরোনো পরিচিত ছিলেন না। মাঝেমধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হতো। অনেক সময় আমার জন্য উপহার পাঠিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করতেন।

হিন্দু শিষ্য ও বন্ধুদের সাহায্যদানের স্বীকৃতি

আমার বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যদের মধ্যে একজন ভদ্র যুবক ছিল, তার নাম হীরা সিং। সে আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত, আমার দুঃখ

হালকা করতে সাহায্য করত। অর্ধেক বিরান, অর্ধেক বসতিহীন এই শহরে অবস্থানকারী লোকদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত শিবজী রাম নামের একজন বুদ্ধিমান লোক বসবাস করত। সে আমার কাছে ছেলের মতো প্রিয় ছিল আমার মতো বেদনায় ভারাক্রান্ত দরবেশকে কখনো একা ছেড়ে যেত না, নিয়মিত এসে সঙ্গ দিত। আমার আদেশ পালন করত এবং কাজ করে দিত। তার ছেলে বালমুকুন্দ একজন ধর্মপ্রাণ ও ভদ্র স্বভাবের তরুণ। পিতার মতো আমার আদেশ পালনে সর্বদা তৎপর এবং আমার দুঃখে সহানুভূতিশীল ছিল।

দূর-দূরান্তে থাকা বন্ধুদের মধ্যে এক প্রিয়জন ছিলেন—তিনি মানবসেবক হর গোপাল তুফতা। তিনি আমার পুরোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন। তিনি আমাকে 'ওস্তাদ' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর কবিতা ছিল খোদার দেওয়া বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এগুলো আমার কাছে ছিল গর্বের ধন। সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি খুবই ভালো লোক ছিলেন। আপাদমস্তক ছিলেন ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ মানুষ। কাব্যচর্চায় তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর বদৌলতে পরিবেশ সরগরম থাকত। সীমাহীন ভালোবাসার সঙ্গে আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের অংশ মনে করতাম। তাঁকে আমি 'মির্জা তুফতা' খেতাব দিই। তিনি মিরাট থেকে আমার কাছে হুন্ডিতে টাকা পাঠান। তা ছাড়া নিয়মিত গজল ও চিঠিও লিখে পাঠাতেন।

এসব কথা লেখা তেমন জরুরি ছিল না; তবুও লিখছি, কারণ, এসব লোকের ভালোবাসা ও উদারতার জন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশই আমার লক্ষ্য। তা ছাড়া এসব কাহিনি যখন বন্ধুদের হাতে গিয়ে পৌঁছাবে, তখন তারা বুঝতে পারবে, এ শহর মুসলমানশূন্য—সে কথা তাদের বুঝতে দেওয়ার জন্য এসব কথা লেখা। রাতে এদের বাড়িতে বাতি জ্বলে না, আর দিনে দেয়ালের জানালা দিয়ে ধোঁয়াও বেরোতে দেখা যায় না। গালিব যে শহরের বাসিন্দা, সেখানে হাজারো বন্ধুবান্ধব আর প্রতিটি ঘরে তার পরিচিতজন ছিল। এখন নিঃসঙ্গ একা। কলম ছাড়া তার সমব্যথী কেউ নেই। নিজের ছায়া ছাড়া কোনো সঙ্গী-সাথিও তার নেই।

এখন আমার চেহারায় সেই লালিমা দেখা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত রক্তের অশ্রু চেহারাকে সিক্ত না করে। আমার দেহের দুঃখ-বেদনা মন ও প্রাণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে এবং আমার বিছানার দৈর্ঘ্য প্রস্থে সেলাই করা সুতা কাঁটায় পরিণত হয়েছে।

বিধ্বস্ত বাড়ি

ওপরে বর্ণিত চার ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে আমার দুরবস্থার সাক্ষীও থাকত না। সে সময়ের দুর্ভাগ্যের জন্য হিংসা হয় এই লুটতরাজের ফলে শহরের কোনো বাড়ির মাটি পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। যদিও আমার বাড়ি লুটেরাদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। আমি শপথ করে বলতে পারি, বিছানা আর পরনের জামাকাপড় ছাড়া বাড়িতে কিছুই ছিল না। যখন কালো (বিদ্রোহী) সৈন্যরা শহর দখল করে নেয়, আমার স্ত্রী আমাকে না জানিয়ে মূল্যবান আসবাবপত্র, অলংকার ও অন্যান্য সামগ্রী গোপনে কালে পিরের ছেলের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়—আমার মালামাল রক্ষার মূলে ছিল আসলে এই ঘটনা। সেখানে আমাদের মালামাল ভূগর্ভস্থ কুঠরিতে রাখা হয় এবং দরজা মাটি দিয়ে বন্ধ করে ফেলা হয়।

যখন বিজয়ী ইংরেজরা শহর দখল করে আর তাদের অনুগত সিপাহিদের লুটপাটের অনুমতি দেওয়া হয়, তখন এই গোপন তথ্য আমার স্ত্রী আমাকে জানায়। ততক্ষণে এসব মালামাল ফেরত আনার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমি নীরব থাকি আর মনকে প্রবোধ দিই এই বলে, এসব জিনিসপত্রের মধ্যে যা যাওয়ার ছিল, তা গেছে। অন্তত সেগুলো আমার বাড়ি থেকে লুট হয়নি।

অভাব-অনটন ও অসহায় অবস্থা

এখন জুলাইয়ের ১৫ তারিখ। আগে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে যে পেনশন পেতাম, তা সংগ্রহের কোনো সুযোগ পাচ্ছি না। বিছানা ও

কাপড়চোপড় বিক্রি করে জীবন বাঁচাচ্ছি। অন্যেরা রুটি খাচ্ছে, আমি জামাকাপড় খাচ্ছি। ভয় হয়, পাছে সব কাপড়চোপড় বিক্রি করে পেট ভরালে উলঙ্গ দশায় না খেয়ে মরব। এই মহাপ্রলয়ের সময় দু-তিনজন চাকর আমাকে ছেড়ে যায়নি। তাদের লালনপালন করতে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মানুষ মানুষের সাহায্য ছাড়া থাকতে পারে না চাকর ছাড়া কোনো কাজ হয় না তা ছাড়া অন্যান্য কর্মচারীও সর্বদা আমার কাছ থেকে সুবিধা নিতে অভ্যস্ত এই খারাপ অবস্থার মধ্যে ওদের দাবি মোরগের কর্কশ আওয়াজের চেয়েও আমাকে বেশি কষ্ট দেয়।

এখন দৈহিক কষ্টের চাপ আর মানসিক অশান্তির কারণে দেহ-মন উভয়ই ধ্বংসের কিনারায়। হঠাৎ মনে হলো, এই খেলনাকে সাজাতে (পুস্তক রচনা) অন্তত কিছুদিন ব্যস্ত থাকা যায়! এই টানাপোড়েনের পরিণতি হয় মৃত্যু, নয়তো ভিক্ষা করা। প্রাথমিক অবস্থায় এ ছাড়া আর কী হতে পারে! এই কাহিনি চিরদিন পরিণতির সমাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পাঠকের মনকে দুঃখে ভারাক্রান্ত করবে

দ্বিতীয় পরিণতি সুস্পষ্ট যে এই পুরো কাহিনিতে এ রকমের বর্ণনা থাকবে যে অমুক গলি থেকে প্রকাশ্যে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অমুক দরজায় তার কিছু মালামাল পাওয়া গেছে। এ কথা কতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে এবং নিজেকে কতকাল অপদস্থ করা যায়! বাকি পাওনা পেনশন পাওয়া গেলেও মনের আয়নায় যে মরচে পড়েছে, সেটা দূর হবে না। আর পেনশন না পেলে পাথরের আঘাতে আয়না চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে (পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়)। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এই দুই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দিল্লির পরিবেশ বিপদগ্রস্ত লোকজনের জন্য উপযোগী নয়। অতএব বাধ্য হয়ে এ শহর থেকে পালিয়ে অন্য কোনো শহরে গিয়ে বসবাস করতে হবে।

দাস্তাম্বু প্রসঙ্গে

১৮৫৭ সালের মে মাস থেকে ১৮৫৮ সালের জুলাই পর্যন্ত শহরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি। ১ আগস্ট কলম হাত থেকে রেখে দিই। আমার

তিনটি প্রত্যাশা অর্থাৎ খেতাব, পেনশন আর উপঢৌকন প্রাপ্তির নির্দেশ সম্রাট ফিরোজ বখতের কাছ থেকে আসতে পারে বলে আশা ছিল। এ ব্যাপারে এ রচনায় আমি লিখেছি। আমার দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ ছিল। সেই সম্রাট, চাঁদ যাঁর মাথার মুকুট, আসমান যাঁর তখত, পারস্যের রাজা জামশিদ আর আলেকজান্ডারের মর্যাদায় যিনি বিভূষিত, রোমের সম্রাটের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, যার বদৌলতে এখনো তাঁর রাজমুকুটের মর্যাদা অক্ষুণ্ন। রাশিয়ার শাসনকর্তার মন সেনা আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল। সূর্যের ধারণা, তার তাপই বিশ্বে অসন্তুষ্টির কারণ। যদি ভীতই না হবে, তাহলে প্রতি মুহূর্তে সে কাঁপে কেন! আবার পূর্ণচন্দ্রের সন্দেহ যে পৃথিবীকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে তার সমান সমান কার্যকারিতা রয়েছে। যদি নিজের অভদ্রতার জন্য ক্ষমা না চায়, তাহলে কেন সে প্রতি রাতে ভয়ে মেঘের আড়ালে চলে যায়!

বাদশাহ সোলেমানের (আ.) সিংহাসন বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেত। অদৃশ্য ফেরেশতা সম্রাজ্ঞীর সামনে উপঢৌকন পেশ করত। তুমি তো দেখেছ, পাহাড়ের বুক চিরে বর্ণিল হীরা-পাথর বের হয়।

সূর্য তার মুকুটের কথা মনে রাখে। না হলে মুক্তা তার কী কাজে লাগে! যদি রানি ভিক্টোরিয়া মুক্তা ছড়ানোর ইচ্ছা করেন, আর মুক্তা ছিটান (বিপুল দানের ফলে) এবং কোনো ব্যক্তি যদি মুক্তা গুনতে চায়, তাহলে গণনা করতে করতে তার আঙুল ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তার সৈন্যরা যদি যুদ্ধের সময় ভয়ে নদী ও পাহাড়কে ধ্বংস করে দেয়, তাহলে পাহাড়ের অজগর আর সমুদ্রের তিমি মাছগুলো মাথা ঠুকে ঠুকে মরে যাবে।

তার জাঁকজমকপূর্ণ রাজত্বের যে রমরমা অবস্থা, বড় বড় সম্রাটও তার দরজায় অনুগ্রহ প্রার্থী। তার সূর্যকিরণের মতো বদান্যতা ও উদারতা আলো দেয় আর মেঘ বৃষ্টিবর্ষণের ক্ষমতা ধরে।

তাঁর বদান্যতা ও উদারতা শিক্ষিত এবং বিজ্ঞজনকে প্রতিপালন করে। তাঁর বিচক্ষণতার বদৌলতে অন্যরা বুদ্ধিদীপ্ত হয়। তাঁর দানশীলতা বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয়। এই বুদ্ধিমতীর নাম বিশ্বের সম্রাজ্ঞী

রানি ভিক্টোরিয়া পাক খোদা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তাঁর রাজত্ব যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়। যদি বিশ্বের রানির দান পেয়ে যাই, তাহলে পৃথিবী থেকে ব্যর্থ মনোরথে চলে যেতে হবে না।

আলাপচারিতা যখন এ পর্যন্ত এসেছে, আমি নীরব হয়ে যাচ্ছি। আমি আর কাহিনি বলতে চাই না।

আমার লেখা শেষ করার পর এই বইয়ের নামকরণ করেছি *দাস্তাম্বু* (অর্থাৎ পুষ্পস্তবক)। এ বই নানাজনের কাছে বিলি করা হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় পাঠাই। উদ্দেশ্য, যাতে শিক্ষিত ও জ্ঞানীজনের হৃদয়ের আশীর্বাদধন্য হয় এবং আমার শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা পড়ে (স্টাইল) তাঁরা মুগ্ধ হন। এই জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য-সংকলন *দাস্তাম্বু* সুবিচারক লোকদের হাতে ফুলের তোড়ার রং ধারণ করবে ও সুবাস ছড়াবে। পিশাচ চরিত্রের লোকজনের দৃষ্টিতে আগুনের গোলাকার বল হয়ে উঠবে। আমিন!

আমার স্বভাবচরিত্রই এ রকম, যা সব সময় গতিশীল থাকে। এর কারণ আর কিছু নয়, আমি আসমানি গোপন রহস্যের ঝরনাস্বরূপ। এ বই আর কিছু নয়, দসাতির (পারসিকদের পবিত্র গ্রন্থ) একটি অংশ। এই কর্মকুশলতা ও অভিজ্ঞতার বিচারে সম্ভবত আমি ষষ্ঠ সাসানের উত্তরসূরি (ইরানের শাসক সাসান)।

মির্জা গালিবের একটি মনোরম স্কেচ

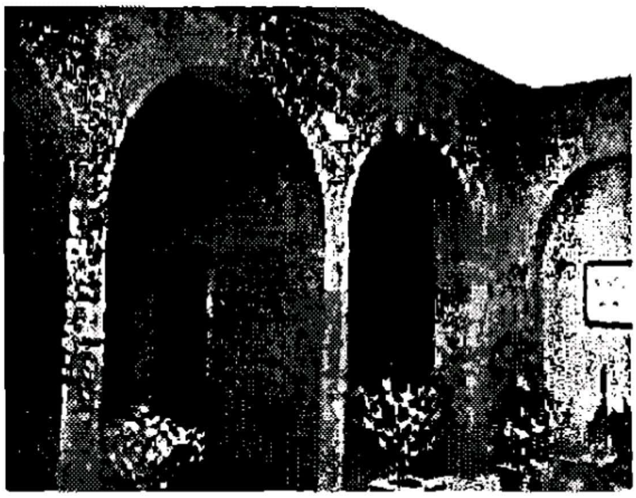

দিল্লির এ বাড়িতে মির্জা গালিব বসবাস করতেন

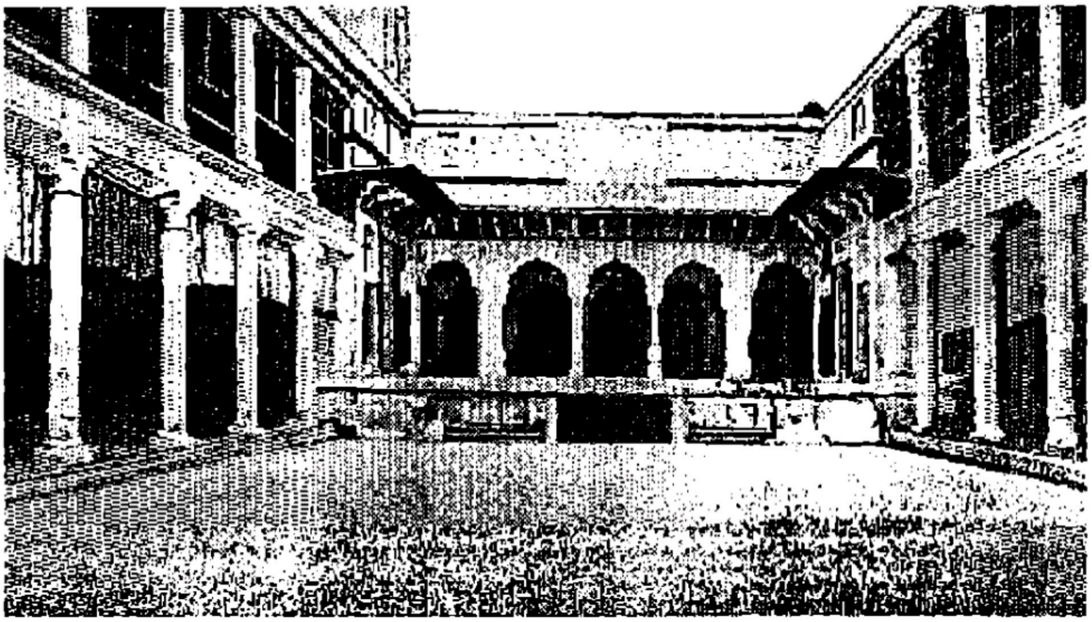

কলাঁ মহল, আগ্রা : এই বাড়িতে মির্জা গালিবের জন্ম

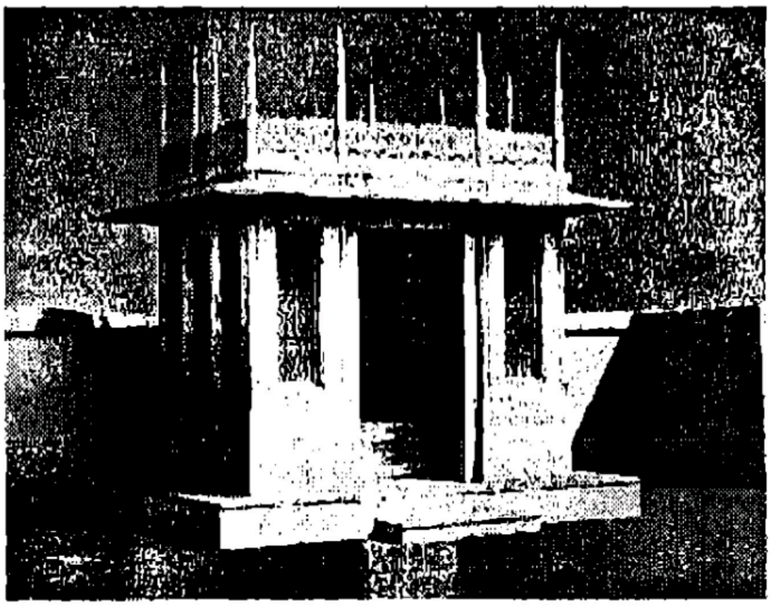

মির্জা গালিবের সমাধি (দিল্লি)

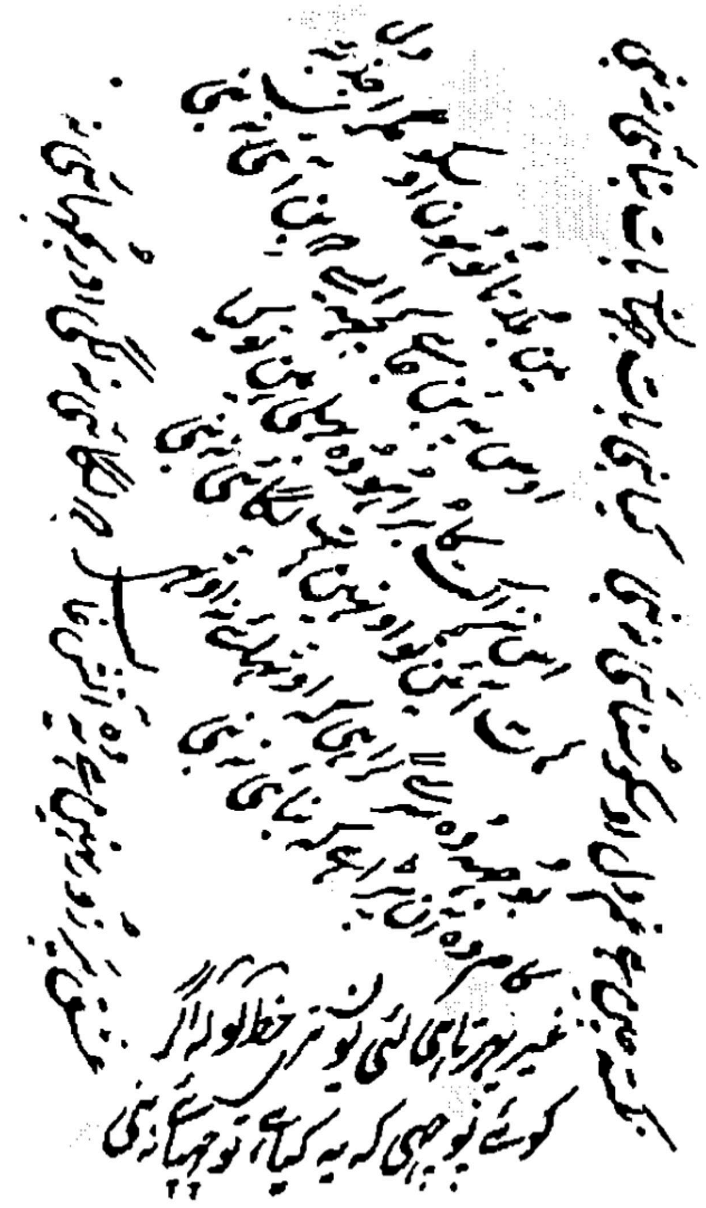

মির্জা গালিবের স্বহস্তে লেখা একটি গজল (৫)

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

পরিশিষ্ট ২
গালিবের গ্রন্থ-তালিকা

পরিশিষ্ট ৩
মির্জা আসাদুল্লাহ্ গালিবের জীবনপঞ্জি

পরিশিষ্ট ৪
সাহিত্যিক জীবনকথা

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. *গালিব আউর আহাং-ই গালিব:* ড. ইউসুফ হোসাইন খান; প্রকাশক : গালিব একাডেমি, নয়াদিল্লি। প্রকাশকাল ১৯৬৮।

২. গালিব: এম মুজিব; প্রকাশক: সাহিত্য একাডেমি, নয়াদিল্লি, প্রকাশকাল ১৯৯৭।

৩. মির্জা গালিব, মূল: পরিচালক গীতিকার গুলজার। ইংরেজি থেকে অনুবাদ আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু; প্রকাশক: আহমদ পাবলিশিং হাউস। প্রকাশকাল ২০০৮।

৪. *Master pieces of Urdu Ghazals* by K. C. Kanda, Sterling paperback (1992).

৫. *দিওয়ানে গালিব*। উর্দু থেকে অনুবাদ : মনির উদ্দীন ইউসুফ, প্রকাশকাল ১৯৬৫।

৬. *Love Sonnets of Ghalib*, Tanslated by Sarfaraz, K. Niazi, published by Rupa & Co., India (2002).

৭. *গালিব কি আপ বিথি* (উর্দু) : প্রফেসর নিসার আহামদ ফারুকী, প্রকাশক: বুক হোম, লাহোর। প্রকাশকাল ২০০৪।

৮. *গালিবের গজল থেকে,* চয়ন ও পরিচিতি : আবু সয়ীদ আইয়ুব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩। প্রকাশকাল ১৯৭৬।

৯. *আতিশ্-এ-গালিব :* যূথিকা তলাপাত্র; প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স লি., কলকাতা। প্রথম সংস্করণ ১৯৯০।

১০. কয়েকটি চিঠি : *মির্জা গালিব*। সংকলন ও অনুবাদ : প্রিয়দর্শী চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক : সাহিত্য আকাদেমি, নয়াদিল্লি প্রকাশকাল ১৯৯৮।

গালিবের গ্রন্থ-তালিকা

উর্দু গ্রন্থ

১. গুল-এ-রানা
২. দিওয়ানে গালিব
৩. উদ্-এ হিন্দি
৪. উর্দু এ মুআল্লা
৫. মকাতিব্-এ-গালিব
৬. খুতুত্-এ-গালিব
৭. নকাত-এ-গালিব
৮. কাদির নামা

ফারসি গ্রন্থ

১. কুল্লিয়াত্-এ-নজম্ এ ফারসি
২. পঞ্জ আহংগ
৩. মেহের-এ-নিমরোজ
৪. দাস্তাম্বু
৫. রাকাত্-এ-গালিব

৬. কাতে বুরহান

৭. সব্‌দ-এ-চিন

৮. দোয়ায়ে সবাহ্‌

৯. ময়খান্‌-এ-আরজু

১০. মুতফর্কাতে গালিব

১১. মুয়াসির্‌-এ-গালিব

মির্জা আসাদুল্লাহ গালিবের জীবনপঞ্জি

১৭৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর আগ্রায় নানার বাড়িতে গালিবের জন্ম। গালিবের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন তুর্কি সেলজুক সম্প্রদায়ভুক্ত। সম্রাট শাহ আলমের আমলে সমরকন্দ থেকে তাঁর দাদা কোকান বেগ খান জীবিকার সন্ধানে ভারতে এসেছিলেন।

১৮০২ গালিবের বাবার মৃত্যু। এর পর থেকে চাচা নসরুল্লাহ বেগের তত্ত্বাবধানে মানুষ হতে থাকেন।

১৮০৬ চাচা নসরুল্লাহ বেগের মৃত্যু। একই সময় গালিব উর্দু শায়েরি লিখতে শুরু করেন।

১৮০৭-৮ গালিব ফারসিতে শের লেখা শুরু করেন।

১৮১০ লোহারুর নবাবের ছোট ভাই ইলাহি বখ্স মারুফের কন্যা উমরাও বেগমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। গালিবের বয়স তখন ১৩। কিছুদিন পর আগ্রা থেকে দিল্লি চলে আসেন। সেখানে মোল্লা আবদুল সামাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ফারসি অধ্যয়ন করেন।

১৮১২ রোমান্টিক প্রণয়ের অধ্যায়।

১৮২১ উর্দু কবিতার প্রথম সংকলন তৈরি করেন

১৮২২ সাল থেকে তিনি ফারসি ভাষাতেই কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং পরবর্তী প্রায় তিরিশ বছর এ ভাষাতেই কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৮২৬ শ্বশুর ইলাহি বখ্‌সের মৃত্যু। ছোট ভাই মির্জা ইউসুফ ৩০ বছর বয়সে পাগল হয়ে যান ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮২৭ পেনসন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কলকাতা যাত্রা। কলকাতায় সিমলা বাজারে ভাড়া বাসায় থাকতেন।

১৮২৮ আবার কলকাতায় উপস্থিতি। ফারসি ভাষার প্রয়োগরীতি নিয়ে এই সময় তিনি জড়িয়ে পড়েন বিতর্কে। *গুল-ই-রানা* নামে ফারসি ও উর্দু কবিতা সংকলন প্রস্তুত করেন।

১৮২৯ গালিব কোলকাতা থেকে দিল্লি ফিরে আসেন এবং তাঁর রচিত উর্দু দিওয়ানের পরিমার্জিত সংকলন তৈরি করেন।

১৮৩১ তাঁর পেনসন-সংক্রান্ত আবেদন নামঞ্জুর।

১৮৩৭ বাহাদুর শাহ জাফর সম্রাট পদে অভিষিক্ত। গালিব তাঁর ফারসি কবিতার সংকলন প্রস্তুত করেন।

১৮৪১ গালিবের বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি। জুয়ার আড্ডা বসানোর দায়ে এক শ রুপি জরিমানা।

১৮৪৭ বাড়িতে জুয়ার আড্ডা বসানোর দায়ে কোর্টে ২০০ রুপি জরিমানা ও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অবশ্য দিল্লির সিভিল সার্জন ডা. রসের সুপারিশে তিন মাস পর গালিব জেল থেকে মুক্তি পান।

১৮৫০ হাকিম আহসান উল্লাহর সুপারিশে সম্রাট বাহাদুর শাহ ফারসি ভাষায় তৈমুর বংশের ইতিহাস লেখার কাজে গালিবকে নিযুক্ত

করেন। তাঁর বার্ষিক বেতন ধার্য করা হয় ৬০০ রুপি গালিব পুনরায় উর্দু ভাষায় শায়েরি ও চিঠি রচনা শুরু করেন।

১৮৫২ গালিবের স্ত্রীর ভ্রাতুস্পুত্র (গালিবের দত্তকপুত্র) আরিফের মৃত্যু। গালিব আরিফের দুই পুত্র বাকির আলী এবং হুসেন আলীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৮৫৪ মহারানি ভিক্টোরিয়ার কাছে খেতাব চেয়ে ও পেনশন দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে গালিব দরখাস্ত পাঠান। বছরের শেষ দিকে জউকের মৃত্যুর পর গালিব সম্রাট বাহাদুর শাহের ওস্তাদ পদে অভিষিক্ত হন।

১৮৫৫ লর্ড অ্যালেন বরার মাধ্যমে গালিব রানি ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ করে লেখা কাসিদা পাঠান।

১৮৫৬ অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ গদিচ্যুত হন। অযোধ্যা ইংরেজ শাসনের অনুগত হয়।

১৮৫৭ লন্ডন থেকে গালিব তাঁর দরখাস্তের উৎসাহজনক উত্তর পান মে মাসে সংঘটিত হয় সিপাহি বিদ্রোহ। সিপাহিদের দিল্লি দখল। গালিবের বন্দী অবস্থায় কালাতিপাত। দিনলিপি *দাস্তাম্বু* ফারসি ভাষায় লিখতে শুরু করেন। পেনশন বন্ধ।

১৮৫৮ হিন্দুদের দিল্লি শহরে ফেরার অনুমতি। পেনশন পুনরায় চালু করার জন্য গালিব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি পাঠান। আগস্টে *দাস্তাম্বু* প্রকাশিত হয়। মহারানি ভিক্টোরিয়াকে ভারতসম্রাজ্ঞী ঘোষণা। ওই বছরেরই নভেম্বর মাসে মহারানির ঘোষণাপত্রে ভারতের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

১৮৫৯ ফারসি শব্দকোষ *বুরহানে-কাতে* সংশোধনের পর গালিব *কাতে-বুরহান* রচনা করেন। রামপুরের নবাব গালিবের জন্য

প্রতি মাসে এক শ টাকা ভাতা মঞ্জুর করেন। নভেম্বরে মুসলমানদের দিল্লিতে ফেরার অনুমতি লাভ।

১৮৫৯ সিপাহি বিদ্রোহের সময় গালিব সম্রাট বাহাদুর শাহের সিক্কা (বাদশাহি মোহর) লিখেছিলেন সন্দেহে পেনশনের জন্য তাঁর দরখাস্ত নামঞ্জুর।

১৮৬০ দিল্লিতে মুসলমানদের সম্পত্তি ফেরত দান। রামপুরের নবাবের আমন্ত্রণে রামপুর গমন। তিন মাস পর গালিব দিল্লি ফিরে আসেন। তাঁর পেনশন আবার চালু করা হয়।

১৮৬২ *কাতে-বুরহান* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। গালিবের অসুস্থতার শুরু। এই অসুস্থতা পরবর্তী দুই বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

১৮৬৩ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে গালিবকে তাঁর পুরোনো দরবারি মর্যাদা ফেরত দান।

১৮৬৫ রামপুরের নবাব ইউসুফ আলী খাঁর মৃত্যু। তাঁর ছেলে নবাব কলব্-ই-আলী খাঁর নতুন নবাব হিসেবে অভিষেক উপলক্ষে গালিবের রামপুর উপস্থিতি।

১৮৬৬ রামপুর থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় আহত। অসুস্থতা সত্ত্বেও দিল্লি ফেরার পর রামপুরের নবাবের জন্য গালিব তাঁর ফারসি ও উর্দু শেরের সংকলন প্রস্তুত করেন।

১৮৬৭ মৃত্যুর পূর্বে ঋণ পরিশোধের জন্য রামপুরের নবাবের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু নবাবের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাননি। মাসিক ভাতা এক শ টাকা প্রদান অব্যাহত থাকে।

১৮৬৮ গালিবের চিঠিপত্রের প্রথম সংকলন *উদ-ই-হিন্দ* প্রকাশিত।

১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে গালিবের মৃত্যু।

সাহিত্যিক জীবনকথা

মির্জা গালিবের পুরো নাম আসাদুল্লাহ্ খান। গালিব তাঁর তখল্লোছ অর্থাৎ উপনাম। তিনি কালের কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি এবং শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফরের সভাকবি ছিলেন। ইকবাল জীবদ্দশায় দেশে-বিদেশে ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ইকবালের নামে ক্যামব্রিজের উর্দু-ফার্সি চর্চার চেয়ার আছে। তদুপরি রেমন্ড নিকলসনের করা ইকবালের ফার্সি গ্রন্থ *আসরারে খুদির* ইংরেজি অনুবাদ বিদগ্ধ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু গালিবের জীবদ্দশায় তাঁর কবিতা নিয়ে তেমন আলোড়নের সৃষ্টি হয়নি।

গালিবের জীবন ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। তাঁর জন্ম ১৭৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর আগ্রায়। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। আগ্রায় থাকতেই মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। এরপর তিনি আগ্রা থেকে দিল্লি এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এখানে ফার্সির পাশাপাশি উর্দু কবিতা রচনায় বেশি মনোযোগী হন। তাঁর শ্বশুর ছিলেন দিল্লির গণ্যমান্য ব্যক্তি। ছাপ্পান্ন বছর তিনি দিল্লিতে বসবাস করেন ভাড়া বাসায়। নিজের কোনো বাড়ি তৈরি করে যেতে পারেননি।

দিল্লিতে এসে তিনি আসাদ নাম ত্যাগ করে গালিব উপনাম গ্রহণ করেন। 'গালিব' মানে জয়ী। তবে তিনি তাঁর সমকালীন কাব্যজগৎকে

জয় করতে পারেননি, সমালোচকদের মুখও বন্ধ করতে পারেননি। জয়ী তিনি ঠিকই হয়েছিলেন, তবে সেটা অন্য যুগে ও অন্য সময়ে। তাঁর বাবা ও দাদা ছিলেন পেশাদার সৈনিক। তাঁদের কাছে কবিতা ছিল অপরিচিত। গালিব পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত না থেকে কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এ প্রসঙ্গে লিখেছেনও তিনি: 'সু পোস্ত সে হ্যায় পেশায়ে আবা সিপাহ্ গিরি কুছ শায়েরি জরিয়ায়ে ইজ্জত নেহি মুঝে।' অর্থাৎ 'আমরা বংশপরম্পরায় পেশাগতভাবে সৈনিক, কবিতা আমার জন্য কোনো সম্মান বয়ে আনেনি।'

গালিবের কাব্যপ্রতিভা ছিল জন্মগত। উর্দু কাব্যের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত ছিল তখন প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে আপস ও ঝগড়া, মান-অভিমান, বিরহ ও মিলনের কথা। গালিব প্রচলিত এই ধারার মধ্যেই ভিন্ন সুর তুললেন। পূর্বসূরিদের যথানির্দিষ্ট পথ না ছেড়েই সেই একই ছকের মধ্যে ফার্সি কবি বেদিলের ঢঙে তিনি লেখা শুরু করলেন এবং অচিরেই নিজস্ব স্বরটি খুঁজে পেলেন। দশ বছর সময়সীমার মধ্যে লেখা কবিতা নিয়ে ১৮৩১ সালে ভূপাল থেকে প্রকাশিত হয় 'নুসখা হামিদিয়া ইয়া নুসখা ভূপাল' নামে *দিওয়ানে গালিব।* এতে ছিল ফার্সিতে লেখা ৬০টি ও উর্দু ভাষার ২০৭টি শের এবং তিনটি কাসিদা। গজল বিভাগে ছিল ১৮৮৩টি শের। কিন্তু এর জটিল বাগ্‌ভঙ্গি পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কথিত আছে, মওলানা আবদুল রামপুরী গালিবকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'মির্জা, তোমার দিওয়ানে এ শেরটা পড়েছি, এর অর্থ কী?

"পহেলা তো রোগনে গুল ভৈস কো অন্ডসে নিকাল,
ফির দবা জিতনে হ্যায় কুল ভৈস কো অন্ডসে নিকাল।"
অর্থাৎ
"প্রথমে যত গোলাপের আতর মোষের ডিম থেকে বেরোল
তারপর যা কিছু পাওয়া গেল তার সবই সেই একই মোষের ডিম থেকে।"'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

চব্বিশ বছরের যুবক গালিব সেই ব্যঙ্গ-পরিহাসকে গায়ে মাখলেন না, বরং হেসে উত্তর দিলেন এই বলে, 'না সতাইশ কি তমন্না না সিলেকি পরওয়া, গর নেহি হায় মেরে আশআর মে মানি ন সহি।'

অর্থাৎ

'আকাঙ্ক্ষা নেই প্রশংসাতে, পরোয়া করি না পুরস্কার,
আমার শের যদি দুর্গম বলো, সে তোমাদের অধিকার।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

গালিব তাঁর শেরের পুরোনো বিষয়বস্তু পরিহার করলেন, সেই সঙ্গে পরিহার করলেন গজলের প্রচলিত রীতি। তাঁর কবিতায় তিনি তুলে আনলেন জগৎ-সংসারের কথা আর প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন মদ্যপানের কথা। মদ্যপানের কারণও তিনি শেরের ভেতর দিয়ে জানালেন। ঘোষণা করার মতো করে বললেন, আনন্দে আর বেদনায় মদের মতো আর কী আছে! মজা লুটবার জন্য নয় বরং দুঃখ ভুলে থাকার জন্য মদের দরকার। তিনি জানতেন, এ মদ তান্ত্রিক-সুফিদের মদ নয়, নিতান্তই বোতলের মদ, যা পার্থিব এবং প্রচলিত ধর্মের পরিপন্থী তাই তিনি লিখলেন,

'ময় সে গরজ নিশাত হ্যায় কিস রুসিয়াহ কো,
এক গুনা বেখুদি মুঝে দিন-রাত চাহিয়ে।'
অর্থাৎ
'মজা লুটতে মদ খেয়েছে কোন সে মুখ পোড়া?
আমি শুধু দিবারাত্রির একটু ভুলে থাকতে চাই।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

১৮৪২ সালে গালিবের *দিওয়ান*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে প্রথম *দিওয়ান*-এর ৪৫০টি কবিতাসহ সর্বসাকুল্যে থাকল ১০৭০টি শের। *দিওয়ান*-এর শেষ সম্পাদনা তিনি করেন ১৮৫৭ সালের আগে। আগের লেখা থেকে ২০০০টি শের সম্পাদনা ও ছাঁটাই শেষে উত্তরপুরুষের জন্য রেখে যান ১৭৯৬টি শের। এই *দিওয়ান*-এ লিখলেন অসাধারণ একটি শের :

'পুছতে হ্যায় উহ কি গালিব কউন হৈ।
কোই বতলাও কে হাম বতলায় কিয়া।'
অর্থাৎ,
'শুধালেন তিনি গালিব কে? কেমনতর সেই লোকটি?
আমি আর বলব কি? কেউ-বা বলে দাও উত্তরটা।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

গালিব নিজেকে কবিতা রচনায় কতটুকু ক্ষমতাধর বলে মনে করতেন, উপরিউক্ত শের থেকে সেটা বোঝা যায়। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি।

গালিবের জীবন ছিল শোক-দুঃখে ভরা। স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি। সাতটি সন্তানের একজনও বাঁচেনি। পালক পুত্র মারা যায়। এক ভাই ছিল পাগল। মর্মান্তিকভাবে তাঁরও মৃত্যু হয়। তিরিশ বছর বয়স থেকে আর্থিক টানাপোড়েন ছিল তাঁর জীবনের নিত্যসঙ্গী। পঞ্চাশ বছর বয়সে অর্থ সমাগমের লোভে বাড়িতে বসান জুয়ার বোর্ড। এই অপরাধে তাঁকে জেলে পর্যন্ত যেতে হয়। তিনি সারা জীবন ছিলেন বেহিসাবি। ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। দিল্লি কলেজের ফার্সির অধ্যাপকের পদ শূন্য হওয়ায় বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে এই পদের তিনি প্রার্থী হলেন। শিক্ষাসচিব টমসন সাহেব ছিলেন গালিবের গুণমুগ্ধ বন্ধু। চাকরির তদ্বির করতে একদিন টমসন সাহেবের বাংলোতে যান। যান পালকিতে চড়েই। কিন্তু টমসন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বাইরে এলেন না। ফলে গালিব টমসন সাহেবের সঙ্গে দেখা না করেই বাসায় ফিরে আসেন। তিনি আর পালকি থেকে নামেননি। অধ্যাপকের পদও গ্রহণ করেননি, অথচ তাঁর সংসারে চলছিল তখন দারুণ আর্থিক অনটন।

কবি এতটাই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে তাঁর বিরুদ্ধে চার-চারটি মামলা রুজু করা হয়। তিনি ঘর থেকে বের হতে পারেন না। মহাজনেরা কবিকে আদালত পর্যন্ত নিয়ে যায়। কবি তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করে কাজির সামনে নিম্নলিখিত দুই পঙ্‌ক্তি কবিতা আবৃত্তি করেন :

'কর্জ কি পিতে ময় লেকিন সমঝতে কিয় হাঁয়,
রং লায়েগি হামারি ফাকা মস্তি একদিন।'
অর্থাৎ,
'ধার করে খাচ্ছি মদ, যাচ্ছে ঠিকই বোঝা
একদিন ঘরে রং ছড়াবে ভুখা থাকার মজা।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

কবিতা শুনে কাজি তাঁকে জরিমানা করেন ঠিকই; কিন্তু কবির প্রতিভার প্রতি সম্মান জানাতে নিজের গাঁট থেকে পয়সা দিয়ে তাঁর ঋণ পরিশোধ করে কবিকে ঋণমুক্ত করে দেন।

চাকরি বা পেনশনই ছিল তাঁর শেষ জীবনের নিত্যসঙ্গী। দিল্লির শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের রচিত রচনাকর্ম দেখে দেওয়ার কারণেই এই মাসিক ভাতা তিনি পেতেন। নিজের অপছন্দ সত্ত্বেও গালিব এই কাজ করতেন। কিন্তু এই দুঃখ তিনি ভুলতে পারেননি লিখেছেন :

'গালিব অজিফা খার হো, দো শাহকু দোয়া
উও দিন গ্যায়ে কি কহ্ তে থে নৌকর নেহি হুঁ ম্যায়।'
অর্থাৎ
'গালিব, তুমি বেতন ভোগী, বাদশাহকে আশীর্বাদ দাও,
সেদিন গেছে, যখন তুমি বলতে আমি কারও চাকর নই।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

সে যুগে সামাজিক জীবনে গণ্যমান্য হওয়া তাঁর ভাগ্যে ছিল না। বাহাদুর শাহের শাহি দরবারের কবি হিসেবে জউকের তখন খুবই রমরমা অবস্থা। গালিবের তেমন কদর ছিল না।

কিন্তু মনের সজীবতাই ছিল গালিবের হাতিয়ার। যখনই অবসাদ তাঁকে গ্রাস করেছে, তখনি তিনি নিজেকে এইভাবে উপহাসের পাত্র করে তুলেছেন :

'ইয়ে মসাইলে তাসাউফ ইয়ে তেরা বয়ান গালিব,
তুঝে হাম ওলি সমঝতে জো ন বাদাখ্বার হোতা।'
অর্থাৎ

'এই ভাগবত সমস্যাতে, গালিব তোমার বাক্যরীতি
লোকে তোকে ঋষি মানতো যদি এত মদ না খেতি।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

অবশ্য কবি জউক ছিলেন প্রাচীনপন্থী আর গালিব আধুনিক চিন্তার অনুসারী। গালিবকে জীবদ্দশায় জউক স্বীকৃতি দেননি। শাহি দরবারে তিনি স্বীকৃতি বা প্রতিষ্ঠা পাননি।

গালিব ছিলেন রোমান্টিক কবি। প্রেমের কবি তিনি জানতেন, বাসনা নিবৃত্তিতে পরিতৃপ্তি নেই। জীবন ভর থাকবে তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণা রূপের, সৌন্দর্যের; সেই তৃষ্ণা ভালোবাসার।

'মিল না তেরা আগর নেহি আসাঁ তো সহল হ্যায়
দুশওয়ার তো ইয়েহি হ্যায় কে দুশওয়ার ভি নেহি।'
অর্থাৎ
'তার মিলনের আশা নেই, আছে ধৈর্য।
কঠিন তো এটাই কারণ কঠিনকেও যে চিনি না।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

'ইশ্‌ক পর জোর নেহি হ্যায় উহ্ আতিশ গালিব
কে লাগায়ে না লগে বুজায়ে না বুজে।'
অর্থাৎ, 'ভালোবাসায় জোর খাটে না এটা এমন আগুন,
লাগাতে চাইলে লাগে না আর নেভাতে গেলে নেভে না।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

প্রেমকে তিনি এভাবেই আগুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জীবনের কামনা-বাসনার যন্ত্রণাও দুর্বিষহ। হয়তো ঈশ্বর বিশ্বাসে সে যন্ত্রণার উপশম হতে পারে। সারা জীবন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার ফলে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে তাঁর চিড় ধরে। গালিব বললেন :

'জিন্দেগি আপনি জব ইস শকলসে গুজরি গালিব,
হামভি কেয়া ইয়াদ করেঙ্গে কি খুদা রখ্‌তে থে।'
অর্থাৎ

'জীবন যখন এ-ভাবে কেটে গেল, গালিব,
আমি ভুলেই গেছি, খোদা বাখর মালিক।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

লোহারুর নবাবের ছোট ভাইয়ের মেয়ে ওমরাও বেগম ছিলেন গালিবের স্ত্রী। উত্তরাধিকার সূত্রে বেগম সাহেবাও বার্ষিক সালানা (ভাতা) পেতেন। দিল্লিতে প্রথম প্রবেশকালে গালিব বেশ সচ্ছলতার ভেতর দিয়ে কাটান তিনি নিজেও উত্তরাধিকার সূত্রে বার্ষিক ৭৫০ সিক্কা ভাতা পেতেন।

নবীন যুবক গালিব রূপে-গর্বে-বিদ্যায়-বুদ্ধিমত্তায় ছিলেন দিল্লি শহরের একটি পরিচিত নাম। তাঁর পরিচিতি ছিল জ্ঞানী-গুণী মহলে আবার বাইজি বাড়িতেও নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এ সময় গালিব এক ডোমনি গায়িকার প্রতি আসক্ত হন। ডোমনি গালিবকে সর্বস্ব ত্যাগ করে ভালোবাসে। কিন্তু গালিবের আসক্তি ছিল চঞ্চল প্রকৃতির, স্বল্পকাল স্থায়ী। ডোমনিকে ত্যাগ করে আবার অন্যত্র শুরু হয় ভ্রমরবৃত্তি। তাকে ছেড়ে গালিবের অন্যত্র যাওয়ার শোকে-দুঃখে-বেদনায় ডোমনি মারা যায়। ডোমনির এই মৃত্যু গালিবকে ব্যথাতুর করে তোলে। তবুও তার 'তওয়ায়েফ মোহে' ছেদ পড়েনি। গালিবের বয়স তখন বিশ কি বাইশ। ডোমনির মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরও গালিব একটি পত্রে তার স্মৃতি রোমন্থন করেছেন এভাবে: 'উমর ভর এক সিতম পেশা ডোমনি কু ম্যায়নে ভি মার রাখা হু।' অর্থাৎ, 'সারা জীবন এই অত্যাচারিণী ডোমনিকে হত্যা করে আসছি।' মান্টো তাঁর 'মির্জা গালিব কি হাশমত কে ঘর দাওয়াত' গল্পে ডোমনির সঙ্গে মির্জা গালিবের ভালোবাসার কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

দিল্লিতে তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে তাঁর পিতৃব্য ও পিতামহের জায়গির ফেরত পাওয়ার দাবি নিয়ে বারবার আরজি পেশ করতে থাকেন। এরপর লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ হয়ে তিনি কলকাতায় পৌছান ১৮২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। লক্ষ্ণৌর নায়েব আগা মির গালিবের আসার খবর পেয়ে তাঁর

সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন গালিব শর্ত দিলেন, তিনি দেখা করতে গেলে আগা মির তাঁর নিজের আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গালিবকে অভ্যর্থনা জানাবেন। গালিবের শর্তে আগা মির (মোতমুদ্দৌলা সৈয়দ খাঁ ওরফে আগা মির) রাজি হননি। গালিব লক্ষ্ণৌতে এই সাক্ষাতের জন্য পাক্কা পাঁচ মাস কাটান। কবি তাঁর এই সময়কার মনের অবস্থা প্রকাশ করেছেন একটি শেরের মাধ্যমে, এইভাবে :

'থি ওয়াতান মে শান ক্যা গালিব কি হো গুরবত মে কদর
বেতলল্লুফ হু ওহ্ মুশতেখস কি গুলখন মে নেহি।'
অর্থাৎ
'স্বদেশে কোথায় মান পেলাম যে বিদেশে পাব খাতির-কদর?
আমি যেন এক মুঠো ঘাস চুল্লিতে নেই বলেই বেখোঁজ।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

কবি গালিব কলকাতায় প্রায় দুই বছর অবস্থান করেন। তিনি কলকাতার সিমলা বাজারে মাসিক ১০ সিক্কা (বাদশাহি মোহর) একটি বাসা ভাড়া নেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছে তিনি পেনশন ও জায়গির উদ্ধারের যে আরজি নিয়ে এসেছিলেন, তা নামঞ্জুর হয়। ফলে গালিব ব্যর্থ মনোরথে আবার দিল্লি ফিরে যান।

কলকাতায় যাওয়া-আসা করার ভেতর দিয়ে গালিবের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। বৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ যে ইংরেজ সভ্যতার অঙ্গীভূত অংশ, গালিব সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। গালিব কলকাতাকে ভালোবেসেছিলেন। তিনি কলকাতার প্রশংসা করে কবিতাও লিখেছেন। সেই কবিতায় তিনি বলেছেন,

'কলকত্তাকে জো জিকর কিয়া তুনে হামনশি,
এক তির মেরে সিনে মে মারা কে হায় হায়।'
অর্থাৎ
'বন্ধু, কলকাতার প্রসঙ্গ কেন তুললে?
আমার বুকে এক তীর যেন বিঁধেছিল।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

বাল্যকাল থেকে কবির আশা ছিল, তিনি জায়গিরদার হবেন, সমাজে সম্মানের আসন পাবেন। কিন্তু সেটা তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। বাড়িতে জুয়ার আসর বসানোর দায়ে ১৮৪৭ সালে কবিকে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই দুর্ঘটনা তাঁর স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেয়। তখন থেকে তিনি সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি লিখলেন তাঁর সেই বিখ্যাত গজল, যেখানে তিনি বলেছেন :

'রহিয়ে অব এ্যায়সে জগা চল কর্ যাঁহা কুই ন হো,
হাম সুখন্ কুই ন হো হাম জবান কুই ন হো।
বেদরো দিওয়ার সা এক ঘর বানানা চাহিয়ে,
কুই হামসায়া ন হো আউর পাসবান কুই না হো।
পড়িয়ে গর বিমার তো কুই না হো তিমারদার,
আওর আগর মর জায়ে তো নোহা খাঁ কুই ন হো।'
অর্থাৎ
'এমন জায়গা খুঁজে নাও তুমি
যেখানে কেউ নেই সমব্যথী
কিংবা সমভাষী আর
বন্ধু-স্বজন নেই,
এমন ঘরের প্রয়োজন আজ
নেই যার চালচুলো,
প্রতিবেশী কিংবা সাহায্য করার কেউ
না থাকুক, সেই ভালো।
রোগে-শোকে কেউ দেখবে-শুনবে
এ-রকম-কিছু যেখানে নেই,
সেখানেই করো বসবাস, কেউ
মরণে কাঁদার নেই।'

[অনুবাদ : মনিরউদ্দীন ইউসুফ]

উল্লেখ্য, ষাটের দশকে অভিনেত্রী সুরাইয়ার কণ্ঠে গালিবের গজলের রেকর্ড বের হয়। তাতে এই গজলও ছিল। সুরাইয়ার গাওয়া গজলের রেকর্ড সে সময় দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

গালিব বাহাদুর শাহ জাফরের অনুরোধে তৈমুরের ইতিহাস রচনায় সম্মত হন। মাসিক বেতন মাত্র ৫০ রুপি, সে যুগে যা একজন কেরানির বেতনের চেয়েও কম ছিল। তৈমুরের জীবনীর প্রথম খণ্ডের নাম *মেহের নিম রোজ* (দ্বিপ্রহরের সূর্য)। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম *মাহে নিম মাহ* (পূর্ণচন্দ্র)। প্রথম খণ্ড ছাপা হলে বাহাদুর শাহের হাতে তুলে দেওয়া হয় ১৮৫৪ সালে। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের কারণে দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি।

১৮৫৪ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত গালিবের জীবন স্বচ্ছন্দে কেটেছে সভাকবি জউকের মৃত্যুর পর গালিবকে রাজসভার প্রধান কবির মর্যাদা দেওয়া হয়। রাজসভার বেতন ছাড়া শাহজাদাদের তরফ থেকে তাঁকে বছরে চার শ রুপি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। ফলে এই কয়েক বছর গালিবের সুখেই কেটেছে। সিপাহি বিদ্রোহের ফলে (১৮৫৭) গালিবের সবকিছু তছনছ হয়ে যায় :

১৮৫১ সালে বাহাদুর শাহ জাফরের ছেলে জওয়ান বখতের বিয়ের আসরে তার ওস্তাদ জউকের সেহরা শুনিয়ে বাহাদুর শাহ গালিবকে কিছু লিখতে বললেন। গালিব লিখলেন, 'দেখে ইস সেহরেসে কহ দে কুই বড়কর সেহরা' অর্থাৎ 'এই সেহরার চেয়ে বড় আর কেউ সেহরা লিখুক'। গালিবের সেহরা ছিল মোট ১২ লাইনের।

উত্তরে জউক লিখলেন :

> 'জিস দানা হ্যায় সুখন কা য়ে সুনা দে উস্‌কো
> দেখ ইস তরহসে কহতে হ্যায় সুখন বর সেহরা।'
> অর্থাৎ
> 'কবিত্বের দাবি যে চাইছে তাকে শুনিয়ে দাও,
> কীভাবে শ্রেষ্ঠ কবি তাঁর সেহরা লিখেছে।'

সেহরার এই লড়াইয়ের খবরে দিল্লিতে হইচই পড়ে যায়। গালিব আর জউকের মধ্যে তুলনাসূচক কথাবার্তা দিল্লি শহরজুড়ে মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

সম্মানহীন কাজে গালিবের সম্মান নেই, আত্মসম্মানবোধ তাঁকে চাকরি নিতে দেয়নি অথচ জীবন ধারণের জন্য মহাজনের গঞ্জনা পর্যন্ত

তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। গালিব এক শেরের মাধ্যমে তাঁর এই আত্মাভিমানের কথা জানিয়েছেন এইভাবে :

'বন্দেগি মে ভি ওহ্ আজাদ খুদবি হ্যায় কে হম,
উলট ফির আয়ে দরে কাবা অগর বা ন হুয়া।'
অর্থাৎ
'প্রার্থনা করার সময়ও আমি স্বাধীন স্বাভিমানী,
কাবার দরজা খোলা না থাকলে অমনি ফিরে আসি।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

১৮৫৭ সালের রাজনৈতিক আলোড়ন তিনি নানাভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। দেখেছেন মোগল সাম্রাজ্যের পতনের দিনগুলো এবং ইংরেজদের আগমনও ঘটেছে তাঁর চোখের সামনেই অথচ এসব ঘটনার প্রতিফলন নেই তাঁর কবিতায় তেমনভাবে. ভাবতে একটু অবাকই লাগে। ঘটনার গতি বুঝতে না পেরে কবি বিদ্রোহী সেপাই এবং ইংরেজ—দুই পক্ষের সঙ্গেই সমদূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। উটপাখির মতো ঘটনার অনিবার্যতার দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজেকে ঘরের কোণে বন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই সময় তাঁর দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের ব্যয় ভয়ানকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর মদের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য গালিবের কিছু সহৃদয় হিন্দু শুভাকাঙ্ক্ষী মিরাট থেকে টাকা পাঠাতেন। দেশি মদ তাঁর সহ্য হতো না। বিলেত থেকে আমদানি করা ওল্ডটম মদ আসত। সিপাহি বিপ্লবের সময় তিনি বাধ্য হয়ে দেশি মদ পানে বাধ্য হন। এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে গালিব জানালেন, 'যেদিন দেশি ফৌজ শহর দখল করে নেয়, সেদিন থেকে সদর দরজা বন্ধ করে বাইরে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিই।' গালিবের লেখা অন্য একটি চিঠি থেকে জানা যায়, সিপাহি বিদ্রোহের সময় তিনি কেল্লায় যাতায়াত করতেন।

এই দুঃসময়ে ১৮৫৭ সালের ৫ অক্টোবর গোরা সৈন্যরা তাঁকে ধরে কর্নেল ব্রাউনের কাছে নিয়ে যায়। কর্নেল জানতে চান, গালিব মুসলমান কি না? জবাবে তিনি বললেন, 'মদ খাই কিন্তু শুয়োর খাই না।' বিপদ-আপদেও গালিব তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা ছাড়তে পারেননি।

সিপাহি বিপ্লবের সময় গালিবের স্ত্রীর মূল্যবান আসবাবপত্র কালে সাহেবের কুঠিতে রেখেছিলেন। সিপাহিরা সেগুলো লুট করে নিয়ে যায় গালিবের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। ১৮৫৭ সালে মির্জা গালিব রামপুরের নবাবের হাতে তাঁর *দিওয়ান*-এর শেষ পাণ্ডুলিপি তুলে দেন এরই অনুসরণে *দিওয়ান*-এর শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে।

তা ছাড়া গালিব তাঁর অন্য সব লেখা (নতুন-পুরোনো) লোহারুর নবাবের দিল্লির বাসভবনে রেখেছিলেন। সিপাহিরা সেই বাড়িতে আগুন দিলে তাঁর সেই সব পাণ্ডুলিপি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সিপাহি বিদ্রোহের সময় গালিব ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতি দেখালেও, বিদ্রোহী ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি তেমন সহানুভূতিশীল ছিলেন না। তবু বাহাদুর শাহের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে ইংরেজরা তাঁর পেনশন বন্ধ করে দেয়। সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হওয়ার দুই মাস পর গালিব বাহাদুর শাহের প্রশংসায় একটি কাসিদা পড়েছিলেন বলে জানা যায়। রামপুরের নবাবের মধ্যস্থতায় ইংরেজরা তাঁর পেনশন আবারও দিতে শুরু করে।

১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অর্ধশতাব্দী যাবৎ যে গানের বুলবুলি ভারতের উন্মুক্ত কাব্য-উদ্যান মুখর করে রেখেছিলেন, তাঁর সেই অনুপম কণ্ঠস্বর চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর শিয়া সম্প্রদায় গালিবের মরদেহ শিয়া প্রথামতে দাফন করতে চায়। কিন্তু লোহারুর নবাব জিয়াউদ্দিন আহমদ কারও কথায় কর্ণপাত করেননি। গালিবের দাফনকাফনসহ যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় সুন্নি মতে। গালিবের ধর্মীয় কোনো মত ছিল কি না, জানা যায় না। তবে শিয়া, সুন্নি দুই সম্প্রদায়ই তাঁর কাছে সমান ছিল। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারের কাছে তাঁকে দাফন করা হয়। সেখানে তাঁর সমাধির পাশে ভারতের হামদর্দ দাওয়াখানা (ওয়াকফ) প্রতিষ্ঠা করেছে গালিব একাডেমি। সেখানেও গালিবকে নিয়ে চলছে গবেষণা ও নানা ধরনের প্রকাশনার কাজ।

মাইকেলের মতো গালিব নিজের জন্য কোনো এপিটাফ লিখে যাননি। মধ্যবয়সে তাঁর লেখা নিম্নোক্ত শেরটিকে অনেকে তাঁর এপিটাফ মনে করে থাকেন। শেরটি নিম্নরূপ :

'গালিব খস্তা কে বেগায়ের কোন সে কাম বন্ধ্ হ্যায়,
রোয়ে জারজার কেয়া কিজিয়ে হায় হায় কুই।'
অর্থাৎ,
'বিশ্বের কোনো কাজ গালিবের জন্য আটকে থাকবে না,
কি দরকার তবে তার জন্য শোকের হাহাকার বা কান্নার বন্যায়?'
অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

গালিব ছিলেন প্রেমের কবি, ভালোবাসার কবি। তাঁর অস্তিত্বকে তিনি প্রবল করে তুলেছেন সৌন্দর্যে মজে থাকার ভেতর দিয়ে। রসবোধহীন বিশ্ব গালিবের কাছে ছিল অর্থহীন। তাই তিনি লিখলেন এক অনন্য শের :

'চন্দ তসবিরে বুঁতা চন্দ হাসিনোঁকে খুতুত,
বাদ মরণকে মেরে ঘর সে ইয়ে সামাঁ নিকলা।'
অর্থাৎ
'কিছু প্রেমিকের রঙিন ছবি কিছু রূপসীর পত্রলিপি,
আমার মৃত্যুর পর এসব সম্পদ পাওয়া যাবে আমার ঘর থেকে।'

রূপসী বাইজির প্রেমের ডিঙিতে একজন পুরুষ প্রতীক্ষায়। গালিবের কবিতা, বিশেষত প্রতীক্ষার কবিতায় লোকায়ত সুর সুস্পষ্ট। নিম্নোক্ত কবিতায় প্রতীক্ষাকারী যখন চরম হতাশায় নিমজ্জিত, সে সময় প্রেমিকার আগমনের উপলব্ধি গালিব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এইভাবে :

'উহ আয়ে ঘরমে হামারে খুদাকি কুদরত হ্যায়,
কভি হাম উনকো কভি আপনে ঘর কো দেখতে হ্যায়।'
অর্থাৎ
'উনি এলেন আমার ঘরে, খোদার কি লীলা,
আমি কখনও তাকাই ঘরের দিকে, কখনও দেখি তাকে।'

[অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত]

গালিবের প্রতীক্ষার শেরগুলো ছিল অসাধারণ। প্রেমিকার নিষ্ঠুরতাকেও তিনি গ্রহণ করেছেন ভিন্নতর বোধে।

'হ্যায় বারে এতেমাদে ওফাদারি ইস কদর
গালিব ইসমে খুশ হ্যায় কে না মেহেরবান হ্যায় '
অর্থাৎ
'তার বিশ্বস্ততার প্রতি এতই আস্থাশীল যে,
গালিব তাতেই খুশি সে তার প্রতি সদয় নয়।'

আরেকটি শের এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতে কবির প্রতীক্ষার কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন—

'জিন্দেগি ঈয়োঁ ভি গুজর জাতি
কিউ তেরা রাহগুজার ইয়াদ আয়া!'
অর্থাৎ
'জীবন তো এ-ভাবেই কেটে যেত
তোমার পথের কথা কেন মনে এল!'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

প্রেমিকার নিষ্ঠুরতার কথা তিনি তাঁর আরেকটি শেরে উল্লেখ করেছেন, যা খুবই স্মরণীয়।

'মোহাব্বত সে নেহি হ্যায় ফরক জিনে আউর মরণে কো,
উসি কো দেখ কর জিতে হ্যায় জিস কাফির পে দম নিকলে।'
অর্থাৎ
'জীবন-মরণের তফাত কোথায় প্রেমে?
তাকে দেখেই বেঁচে থাকা সেই সর্বনাশী প্রাণ হানে।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

কৌতুক-পরিহাস তাঁর শের-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এই শের পাঠককে আনন্দ দেয়। কবির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল রসিকতা।

'কাহাঁ মায়খানা কা দরওয়াজা গালিব আউর কহাঁ ওয়াজই;
ফের ইতনা জানতে হ্যায় কাল উহ জাতা থা কে হাম নিকলে।'
অর্থাৎ
'কোথায় পানশালার দরজা, গালিব কোথায় বা আচার্য
আমি যখন কাল বের হচ্ছিলাম, তিনি তখন প্রবেশরত।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

হয়তো পরিহাসবোধে মজে গালিব প্রেমে উত্তরণ চাননি দুনিয়ার বন্ধন মেনে নিয়েই রসে মজে থাকতে চেয়েছেন। রসিকতার ভেতর দিয়েই জীবনযন্ত্রণাকে ভুলতে চেয়েছেন।

'সও বার বন্দই ইশ্‌ক সে আজাদ হম হুয়ে
ফের কিয়া করেঁ কে দিলহি উদু হ্যায় ফিরাগ কা।'
অর্থাৎ
'শতবার আমি প্রেমের শৃংখল থেকে মুক্তি পেয়েছি
কিন্তু কী করব, আমার হৃদয় যে মুক্তির প্রতিকূলে।'

অনুবাদ : সাধন দাশগুপ্ত

১৯৩৯ সালে বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত গার্সিন দ্য টাসি রচিত *হিস্টোরি অব হিন্দি অ্যান্ড হিন্দুস্থানি লিটারেচার* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মাধ্যমে গালিব পাশ্চাত্যে কিছুটা পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে গালিবের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ২০০২ সালে ভারত ও পাকিস্তান থেকে রূপা অ্যান্ড কোম্পানি এবং ফিরোজ সন্স গালিবের *দিওয়ান*-এর ইংরেজি অনুবাদ একখণ্ডে প্রকাশ করেন। অনুবাদ করেছেন বিখ্যাত পণ্ডিত ড. সরফরাজ কে নিয়াজি। বইটির নামকরণ করা হয়েছে *Love Sonnets of Gholib*। ইতিমধ্যে বইটির পাঁচটি সংস্করণ হয়েছে। বিগত দুশো বছরে প্রথমবারের মতো গালিবের সমগ্র উর্দু প্রেমের কবিতা ইংরেজি অনুবাদে একখণ্ডে একত্রে প্রকাশিত হলো। ফলে, পাশ্চাত্যের পাঠকমহলে গালিবের ব্যাপক পরিচিতি ঘটেছে।

বইটির ভূমিকা লিখেছেন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, উর্দু ভাষার বিশিষ্ট পণ্ডিত ড. ফরমান ফতেহপুরি। ভূমিকায় গালিবকে তিনি উর্দু ভাষার শেক্‌সপিয়ার বলে উল্লেখ করে লিখেছেন :

'Mirza Ghalib is to the Urdu language what William Shakespeare is to the English language. And the most widely read urdu book in the world is a collection of the love sonnets of Ghalib. Ghalib is not just an Asian phenomenon and his

sonnets are loved and studied world wide. Ranking with the likes of Omar Khayyam and Rumi, his sonnets promise to win the hearts of millions and because of their reflections associated with love loving they are, and always will be universal.' ড. ফরমান ফতেহপুরির উপরিউক্ত মন্তব্য ষোলআনা সত্য।

গুলজারের প্রযোজনায় বোম্বের বিখ্যাত অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহের অভিনয়ে ভারতীয় টিভি চ্যানেলে প্রচারিত টিভি সিরিয়াল আপামর মানুষকে মির্জা গালিবকে জানতে সাহায্য করেছে। এর আগে ১৯৬১ সালে পাকিস্তানে নির্মিত হয়েছিল মির্জা গালিবকে নিয়ে একটি ছায়াছবি। এই ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পাকিস্তানের সুপারস্টার সুধীর এবং প্রেমিকা চৌদভির ভূমিকায় নূর জাহান।

অন্য দিকে দরদি কণ্ঠের অধিকারী ভারতীয় গায়ক জগজিৎ সিংয়ের গাওয়া গালিবের গজল গালিবকে উপমহাদেশে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে।

বেঁচে থাকতে গালিব দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু এখন তাঁর মৃত্যুর ১৪০ বছর পর তিনি উর্দু কবিতার প্রাণপুরুষ হিসেবে এবং কিংবদন্তির কবির অভিধায় অভিহিত। কাব্যরসিকেরা গালিবকে উর্দু কাব্যসাহিত্যের শীর্ষচূড় ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য করে থাকেন। ইংরেজি অনুবাদের ফলে ইদানীং গালিবের খ্যাতি উপমহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী মির্জা গালিবের জীবন নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করেছে। বাংলাদেশেও একটি তরুণ নাট্যগোষ্ঠী মির্জা গালিবের জীবনকাহিনির নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করেছে : মির্জা গালিব উর্দু কবিতার প্রাণপুরুষ হিসেবে আমাদের কাছে এখনো জীবন্ত। তাঁর মৃত্যু নেই।